কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর '৮১

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

ছোটদের বই

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদার জুড়ি নেই	৫-০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা	৫-০০
ঘনাদা বিচিত্রা	১২-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

টেনিদার অভিযান	১৫-০০
চারমূর্তি	৫-০০
ঝাউবাংলোর রহস্য	৫-০০
কম্বল নিরুদ্দেশ	৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	১০-০০
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন	৮-০০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪-০০
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ	৪-০০
পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা	৪-০০

সমরজিৎ কর

ভয়ংকর সেই অভিযান	১৫-০০
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	১৫-০০

স্বপনবুড়ো

বুক অব নলেজ	১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো	১৫-০০
রোমাঞ্চকর রসায়ন	১২-০০

অমরনাথ রায়

সংখ্যা নিয়ে খেলা	৫-০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	৫-০০

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

বাঙলার নবাবী আমল যখন শেষ, ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচ্ছে। বন-বাদাড় প্রচণ্ডই আছে। ভাল রাস্তাঘাটও হয়নি। পথিক পথ চলতে ভয় পায়। গেরস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয়—'হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের গোঁজা জবা ফুল।' মুখে হা-রে-রে পিলে-চমকানো ডাক। তারাই বাঙলার ডাকাত। সেইসব কাহিনী জানা মানেই প্রাচীন বাঙলাকে জানা। এই বই লিখে যোগেন্দ্রনাথ হৈ চৈ ফেলেছিলেন। আবার সেই বই বেরুল।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙলার ডাকাত	
চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড	৬-০০
মহিম ডাকাত	১০-০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত দস্যুকাহিনী	৬-০০

জীবনচরিতমালা

দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনকথা। অপরূপ ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

রাজা রামমোহন	৫-০০
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ	৫-০০
শরৎচন্দ্র	৫-০০
পরমাপ্রকৃতি সারদামণি	৫-০০
আলোকময়ী শ্রীমা	৬-০০
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫-০০
জীবনীশতক	২৫-০০
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ	১০-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩

১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ॥ সেপ্টেম্বর ১৯৮১

সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় ঃ ১
চিঠি ঃ ২
দপ্তর থেকে
ভূমিকম্প ঃ সমরজিৎ কর ৪
উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার
ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ৯
গল্প
গহন রাতের সূর্য ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ ৪২
জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
ভারতের প্রথম সঞ্চার উপগ্রহ ঃ বিমান বসু ৩৭
মাটি থেকে আকাশে ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪৯
পড়াশোনা
পড়া পড়া খেলা ঃ অলক চক্রবর্তী ২৭
সুদ কষার সহজ নিয়ম ঃ অরূপরতন ভট্টাচার্য ২২
রসায়নের সহজ পাঠ ঃ অমরনাথ রায় ১৩
আবিষ্কারের গল্প
স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার ঃ প্রদীপ রায় ৩১
অন্যান্য রচনা
বিজ্ঞানের ভেল্কি ঃ এ, সি সরকার ৪০
ডাইনোসোরের মৃত্যু ঃ অলককুমার সেন ২৯
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
আধুনিক কালের বিজ্ঞানী সি ভি রমন ঃ
বিমলেন্দু মিত্র ১৮
ছবিতে গল্প
অজানা মহাকাশে ঃ ২০
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ঃ ৫৬
পশুপাখির পরিচয়
বাদুড় ঃ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৪৭
নিয়মিত বিভাগ
সংখ্যাকূট ৩ ॥ বিজ্ঞান বিচিত্রা ৭
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ৪১ ॥ টুকিটাকি ৪৮
বিজ্ঞান সংবাদ ৫৪
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প ও
বিজ্ঞান ভবন ঃ কিন্নর রায় ৫২

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ঃ রবীন বল
সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

সম্পাদকীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঞ্চম সংখ্যা বের হল। এই সংখ্যায় ভারতের মহাকাশ গবেষণার সাম্প্রতিক সাফল্য প্রথম সঞ্চার উপগ্রহ অ্যাপল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শ্রীবিমান বসু। পড়াশোনা বিভাগে আর একটি নতুন বিভাগ যুক্ত হয়েছে পদার্থবিদ্যা। অঙ্ক ও রসায়ন বিভাগের লেখা তো আগেই শুরু হয়েছে। পূজোর পর থেকে জীবন বিজ্ঞানের উপরে ধারাবাহিক রচনা শুরু করবেন ডঃ তারক মোহন দাশ। এই সংখ্যা থেকেই 'চিঠিপত্র' বিভাগ খোলা হল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পূজোর পরেই 'ছোটদের আসর' হয়তো শুরু করা সম্ভব হবে—যে বিষয়ে আগ্রহ জানিয়ে প্রচুর চিঠি দপ্তরে জমা পড়েছে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর দপ্তরে দুর্ধর্ষ শারদ সংকলনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে—যে বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়বেই।

চিঠিপত্র

১লা আগস্ট সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় গোপালবাবুর প্রতি যথার্থ মর্যাদা রাখা হয়েছে। ২।১ টা লেখা সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে। ৭ম পৃষ্ঠায় ২য় column এ ৪র্থ line এ, 'অপরিবর্তনীয়' কথাটা কি হবে? এটা বোধহয় 'পরিবর্তনীয়' বলাই ঠিক হবে। কারণ পরে যখন একটা 'না' শব্দ রয়েছে। পড়তে confusion হবে কিশোর পাঠকদের। ৮ম পৃষ্ঠায় ২য় column এ ১৩ লাইনে, "গতিবেগ কত? v+v? মোটেই না!" "এই মোটেই না" কেন বলা হল। ওইটাই ত হবে এ ক্ষেত্রে এবং সেটা প্রমাণ করা হল পরবর্তী Paragraph-এ। যদি ঐ মানই হয় (এবং যা ঠিক) তবে মোটেই না এ বাক্যটা বলাটা কি সঙ্গত?

লেখক ঐ প্রবন্ধের ৭ম পৃষ্ঠায় আইফেল টাওয়ারের ব্যাপারটাতেই ২য় column-এ ১১ লাইনে বলছেন যে, যদি বরফের তৈরী হতো—এ কথাটা একদম অবাস্তব। কারণ বরফের তৈরী হলে গরমে ৪০°তে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। আর তাতে ছোট বড় হওয়ার (৬৬০ মিমি) কথাই ওঠে না। ওটা হওয়া উচিত বরফের বেশী বলে ০°-সে. এর নীচে থেকে যদি তার পার্থক্য ৪০°সে. হত সে ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটত। বাক্যটা খুবই confusing।

ডঃ সমীরকুমার ঘোষ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

ডঃ সমীর ঘোষের প্রশ্নের উত্তর

শ্রী ঘোষের মতো যত্নবান সচেতন পাঠকই আমরা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আশা করি। ও'র বক্তব্যের প্রথম অংশের সঙ্গে আমি একমত এবং অনভিপ্রেত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য দুঃখিত।

দ্বিতীয় অনুযোগ সম্পর্কে বলি আমার লেখায় আইফেল টাওয়ার যদি বরফের তৈরি হতো···বাক্যটিই সুস্পষ্ট কল্পনার ইঙ্গিত দেয়, যে কাল্পনিক সম্ভাবনার মাধ্যমে বরফের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক কিশোর-কিশোরীদের সচেতন ভাবে জানানো হয়েছে।

শ্রী ঘোষ বলেছেন,—40°C থেকে O°C পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিবর্তন ধরে নিলে কল্পনা বাস্তবসম্মত হতো—তাতে বরফ বরফই থাকতো; বিজ্ঞানগত কোন ত্রুটি থাকতো না। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, তা সত্ত্বেও বক্তব্যটি বিজ্ঞানের দিক থেকে নির্ভুল হতো না। কারণ, বরফ বরফ থাকলেও তা দিয়ে সত্যি সত্যি কোন টাওয়ার জাতীয় কাঠামো তৈরি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বক্তব্যের কল্পনাগত দিকটিকে প্রশ্রয় দিয়েই বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকু সকলকে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি।

তৃতীয় যে ভুলটি শ্রী ঘোষের চোখে ধরা পড়েছে, তা হলো, লব্ধ গতিবেগ নির্ণয়ের সূত্রকে (v+V) আমি একবার ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করেছি, আবার পরক্ষণে অঙ্কের মাধ্যমে সেই ভ্রান্ত সূত্রেই উপনীত হয়েছি। এইখানে কোন সমীকরণ দু-ধরনের চরিত্র সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। এক ঃ আসন্ন সমাধান (Approximate Solution) ও দুই ঃ যথাযথ সমাধন (Rigorous Solution)। আমার আলোচনায় উল্লেখ ছিলো, আইনস্টাইনের সমীকরণটি হলো যথাযথ সমাধান, যা থেকে কিছু পদ উপেক্ষা করলে আসন্ন সমাধান পাওয়া যায়। সুতরাং যথাযথ সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন সমাধান (=V+v) মোটেই নিভু'ল নয়। যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যথাযথ ও আসন্ন সমাধানের লক্ষণীয় তফাৎ খুব একটা চোখে পড়ে না। যথাযথ সমাধানকে গুরুত্ব দেবার জন্যই আসন্ন সমাধানকে আমি 'ভুল' বলে উল্লেখ করেছি। এর ফলে যদি পাঠকমহলে কোনরকম বিভ্রান্তির উদ্রেক হয়ে থাকে তাহলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। পরিশেষে শ্রী ঘোষকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ করবো ভবিষ্যতেও তাঁর সুচিন্তিত সমালোচনা দপ্তরে পাঠানোর জন্য।

ইতি—অনীশ দেব
কলকাতা-৯

মহাশয়,

আপনাদের প্রকাশিত "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" নিঃসন্দেহে কিশোর যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত বিজ্ঞান জিজ্ঞাসু জ্ঞান পিপাসু মনের খোরাক যোগাবে এবং সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে যুক্তিবাদী হ'তে সাহায্য করবে। কিন্তু যেহেতু "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" বিশেষ করে কিশোরদের জন্যে প্রচারিত এবং বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর সেহেতু সেগুলি প্রকাশের সময় তার নির্ভুলতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা আবশ্যিক বলে মনে করি। যদিও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই এবং উত্তর তিরিশের এক বয়স্ক ব্যক্তি তবু আপনাদের জুলাই-৮১ সংখ্যায় সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'পারমাণবিক ঘড়ি' প্রবন্ধে একটি

মারাত্মক ভুল নজরে আসায় আপনাদের গোচরে আনার চেষ্টা কোরছি। উক্ত প্রবন্ধের শেষ দিকে **বলা হয়েছে আলোর গতি তিন কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে**। ওটা হওয়া উচিত ছিল প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। কিন্তু যেহেতু প্রাবন্ধিক বিষয় নিখুঁত সময় জ্ঞাপক সেহেতু আলোর গতিও নির্দিষ্টভাবে বলা **উচিত সেকেণ্ডে ২৯৯, ৭৯২'৫ কিমি**। কেননা উক্ত গতিবেগই আলোর মৌলকণিকা ফোটনের গতিবেগ এবং ফোটনের গতিবেগকেই আলোর গতিবেগ হিসাবে ধরা হয়। আশা করি পরের কোন সংখ্যায় উক্ত ভুলটি শোধরানোর ব্যবস্থা করে অসংখ্য বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুকে সঠিকতা নির্ধারণে বাধিত কোরবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আমি আপনাদের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক।

নমস্কারান্তে—

শ্রীগৌরহরি চক্রবর্তী

স্বরাষ্ট্র (কর্মীবৃন্দ ও প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগ
রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা-৭০০০০১

জুন '৮১ সংখ্যায় সুনীল সরকারের "বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ঃ "ফ্লোরেল" এই প্রবন্ধে তথ্যগত ভুল চোখে পড়লো। তিনি লিখেছেন, "এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিলো ইংরেজী 1967 সালের 27 ডিসেম্বর। ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে অ্যাপোলো মহাকাশযান তিনজন মহাকাশচারী নিয়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দিলো। নির্দিস্ট গ্রহের কক্ষপথে পৌছুবার অনেক আগেই সেই মহাকাশযানে আগুন ধরে গেল। পৃথিবীতে বিপদ বার্তাটুকু পাঠিয়ে তাঁরা মহাশূন্যেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। মৃত্যুবরণ করলেন মহাকাশচারী আসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট এবং রজার শাফে।"

এখানে জানাতে চাই, আজ পর্যন্ত মনুষ্যবাহী কোনও মহাকাশযানকেই অন্য গ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় নি। মনুষ্যবাহী মহাকাশযান কেবলমাত্র চাঁদ পর্যন্ত গেছে। উক্ত দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল 1967 সালের 27শে জানুয়ারী, 27শে ডিসেম্বর নয়। আর দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল মহাশূন্যে নয়, পৃথিবীর বুকেই। দুর্ঘটনার সময় ভার্জিল গ্রীসম্, এডওয়ার্ড হোয়াইট এবং রজার বি শাফে প্রক্ষেপণ যানের উপরে বসানো অ্যাপোলো কমাণ্ড 'মড্যুলে বসে সেইসব কাজ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন যেগুলো তাদেরকে মহাশূন্যে করতে হত। এমন সময় চাপনিয়ন্ত্রিত স্যুটে হঠাৎ অক্সিজেনের সরবরাহ দারুণ বেড়ে যায় এবং মহাকাশচারীদের চিৎকার শুনা যেতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় দূরদর্শন ক্যামেরা দিয়ে দেখা যায় ক্যাপসুলের ভিতরে লেলিহান আগুনের শিখা। উদ্ধারকারীদের মহাকাশচারীদের কাছে পৌছতে পাঁচ মিনিট সময় লেগেছিল। ততক্ষণে মহাকাশচারীদের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

পরিষ্কার বোঝা যায় লেখক সত্যের ধার না ঘেঁসে নিছক কল্পনাকে নির্ভর করে উপরোক্ত লাইনগুলো লিখেছেন, একটি বৈজ্ঞানিক রচনায় এটা অভাবনীয়।

এই প্রবন্ধেই লেখক জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থা (পৃঃ ২৬), জাতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা (পৃঃ ২৬), মহাকাশ-বিজ্ঞান সংস্থা (পৃঃ ২৭) প্রভৃতি অভিব্যাক্তিগুলো ব্যবহার করেছেন সম্ভবতঃ NASAর প্রতিশব্দ হিসাবে। প্রকৃত-NASAর বাংলা জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা অনেকের লেখায় চোখে পড়েছে। মনে হয় এটাই যথার্থ বাংলা।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কিশোরদের মনের মত পত্রিকা। কাজেই এই পত্রিকায় নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত হোক, এটাই কাম্য।

—ইতি
বিমলকান্তি সেন
নতুন দিল্লী-৬০

সংখ্যাকূট

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী

নীচের ইঙ্গিত অনুযায়ী সংখ্যা বসিয়ে সমাধান কর ঃ

পাশাপাশি

a—সোডিয়ামের যোজ্যতা ;

b—আয়োডিনের গলনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ;

d—অ্যাক্টিনিয়ামের পারমাণবিক ওজন ;

e—যে সংখ্যার যোগ বা বিয়োগে কোন প্রভাব নেই ;

উপর থেকে নীচে

a—বাতাসে শব্দের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে যত ফুট হয় ;

b—যত মাসে বছর হয় ;

c—রুবিডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা।

ভূমিকম্প

সমরজিৎ কর

কয়েক সপ্তাহ আগে কী দারুণ ভূমিকম্পই না হয়ে গেল ইরানে। এই ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে এক হাজারেরও বেশি মানুষ। সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে কয়েক শ' কোটি টাকার মত।

বলতে কী, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে ভূমিকম্প যেন জীবন্ত বিভীষিকা। ভূবিজ্ঞানীদের হিসেব মত ছোট বড় মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর ভূকম্পন ঘটে ১৫০০০০ বার। এদের মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য মৃদু কম্পন। মৃদু কম্পনে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। কম্পনের মাত্রা বেশি হলেই ঘটে মারাত্মক ব্যাপার।

কোন বস্তু ওজন মাপার জন্যে যেমন তোমরা ব্যবহার কর গ্রাম, পাউণ্ড প্রভৃতি একক, দূরত্ব মাপার জন্যে কিলোমিটার, মাইল, জমির ক্ষেত্রফল মাপার জন্যে হেক্টর অথবা একর, তেমনি কোন জায়গায় ভূমিকম্প হলে তার কাঁপুনির মাত্রা মাপার জন্যে কাজে লাগান হয় এক ধরনের একক। যার নাম 'রিখটার স্কেল'। এই এককটি তৈরি করেন সি. এফ. রিখটার নামে একজন জার্মান ভূবিজ্ঞানী। রিখটারের সম্মানেই ভূকম্পন মাপার এককটির নাম হয়েছে 'রিখটার স্কেল'। এই মাপ অনুযায়ী বলা হয়, মোটামুটি অনুভব করা যায় অথচ ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয় না। কোথাও এমন ধরনের ভূমিকম্প হলে তার মাপ দাঁড়াবে ২.৫ রিখটার। ভূমিকম্পে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় বাড়িঘর ভাঙ্চুর হলে কম্পনের মাপ দাঁড়ায় ৪.৫ রিখটারের মত। ৬ থেকে ৭ রিখটার মাপের ভূকম্পন খুবই মারাত্মক। ইরানের কম্পন ৭.২ রিখটারের মত ছিল। বর্তমান শতকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক যে ভূমিকম্প ঘটে তার মাপ ছিল ৮.৬ রিখটার। বিজ্ঞানীরা বলেন কোন জায়গায় যদি ৫ রিখটারের মত কম্পন ঘটে, তা হলে সেই কম্পনের শক্তি সেখানে যা দাঁড়াবে তার পরিমাণ ১৬ জুলাই, ১৯৪৫ সালে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যে পরমাণু বোমাটি ফাটান হয় তার শক্তির মত। আর কোথাও যদি এমন ভূমিকম্প ঘটে, যার মাত্রা হয়ত দাঁড়াল ৮.৬ রিখটার, তা হলে সেখানে ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ রিখটারের শক্তির তিরিশ লক্ষ গুণ। হিরোসিমায় ফাটান প্রথম পরমাণু বোমার সমান। বুঝতেই পারছ, ভূমিকম্পের দরুন কী প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তিই না ধ্বংসের কাজটি ঘটায়।

হ্যাঁ, ভূমিকম্প ঘটে পৃথিবীর সর্বত্র। প্রতি বছর। তবে সবচেয়ে বেশি প্রশান্ত মহাসাগরের কিনারা বরাবর। শতকরা ৮০ ভাগ। শতকরা ১৫ ভাগ ঘটে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে। অবশিষ্ট ৫ শতাংশ পৃথিবীর বাকি অঞ্চলে। মজার ব্যাপার এই যেখানে ভূকম্পনের শুরু, যার নাম দেওয়া হয় 'এপিসেন্টার' বা উৎকেন্দ্র, সেখান থেকে কম্পন বহুদূর পর্যন্ত ছড়ায় কখনও কখনও। নির্দিষ্ট পথ ধরে। এমন একটি পথ বার্মা থেকে শুরু করে হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে, বেলুচিস্তান, ইরান হয়ে আলপ্স পর্বতের ভেতর দিয়ে ইউরোপের ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

মৃদু ভূমিকম্পে তেমন ভয় থাকে না। কিন্তু কম্পনের মাত্রা বেশি হলেই মুশকিল। তখন বড় ছোট ঘরবাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। পাহাড় পর্বতের পাথরে ধরে ফাটল। বড় বড় পাথরের চাঁই ভেঙ্গে পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে থাকে। তার আঘাতে পার্বত্য গ্রাম, শহর এবং চাষের জমির ক্ষতি হয়। কোন কোন জায়গার জমি বসে যেতে পারে। আবার উপরের দিকে ঠেলে উঠে ছোট খাট পাহাড়ও তৈরি করতে পারে। ভূমিকম্পের দরুন নদী, হ্রদ অথবা সমুদ্রের জলে তোলপাড় শুরু হয়। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, খুব সাবধান! ভূমিকম্পের সময় কখনও বড় নদী অথবা সমুদ্রের ধারে দাঁড়াবে না। সমুদ্রের ধারে হয়ত দাঁড়িয়ে আছ। হঠাৎ দেখলে, বেলাভূমি থেকে সমুদ্রের জল দ্রুত সরে যাচ্ছে। তখন যত দ্রুত সম্ভব বেলাভূমি থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিৎ। কারণ অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে, সমুদ্রের জল প্রবল উচ্ছ্বাসে ধেয়ে আসছে বেলাভূমির দিকে। যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলে সে জায়গাটি ভাসিয়ে দিয়ে জল আরও উপরে উঠে এসেছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর উচ্চতা তখন তিরিশ, চল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ ফুটও হতে পারে। এ ধরনের জলোচ্ছ্বাসের কারণ সমুদ্রের নিচে কোন জায়গার ভূকম্পন। জলের ওই তরঙ্গকে বলা হয় 'ভূকম্পন জাত সমুদ্র তরঙ্গ'। জাপানী ভাষায় বলা হয় 'সুনামি'। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এই তরঙ্গে পৃথিবীর সমুদ্র তীরবর্তী অনেক শহর ভেসে গেছে। কোন কোন সময় ভূমিকম্পের দরুন প্রচণ্ড গর্জনকারী শব্দও শোনা যায়।

ভূমিকম্প কেন হয়?

প্রাচীনকাল থেকে এ নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে কত রকম জল্পনাই না হয়েছে। যেমন পৃথিবীকে মাথায় করে দাঁড়িয়ে মস্ত এক দানব। সে যখনই মাথা ঝাঁকায় পৃথিবী তখনই কাঁপে। প্রাচীন জাপানীরা ভাবত মস্ত এক মাকড়সার পিঠে অথবা ক্যাট মাছের পিঠে পৃথিবী বসে। মঙ্গোলিয়ার মানুষ ভাবত, মস্ত এক কাছিম পৃথিবীকে পিঠে করে বসে থাকে। আর ওই সব জন্তু নড়া চড়া করলেই কাঁপতে থাকে পৃথিবী। প্রাচীন গ্রীস দেশের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খৃস্ট পূর্বাব্দ)। তিনি ভাবতেন, পৃথিবীর ভেতর মাঝে মাঝে জমতে থাকে বাতাস। সেই বাতাস পৃথিবীর ভূস্তরের ফাঁক পথে যখন প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে, তখন ভূমিকম্প হয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানে বলা হয়, পৃথিবীর কোন জায়গায় ভূস্তরে ফাটল ধরে হঠাৎ যদি ভূচ্যুতি ঘটে, তখন হয় ভূমিকম্প। অবশ্য গ্যাসের প্রচণ্ড চাপে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বিস্ফোরণ ঘটলেও ভূমিকম্প হয়।

কারণ অবশ্য আরও আছে। বিপদ এই, কোথায় কখন বৃষ্টি বা ঝড় উঠতে পারে, সে কথা আমরা যেমন আগে থেকে জানতে পারি, কোথায় কখন ভূমিকম্প হতে পারে, সে কথা আগে থেকে জানা খুবই দুষ্কর। এ ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

যাই হোক, শুনলে অবাক হবে, কখনও কোন কোন প্রাণীর আচরণ দেখে কিন্তু ভূমিকম্পের সম্ভাবনার কথা অনেক সময় জানা যায়। এখানে সে সম্পর্কেও দু' একটা কথা বলি।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রবাদ আছে ঃ কুকুরের গড়গড় ডাক, গরুর চিৎকার; কিংবা হঠাৎ দেখা গেল, দিন দুপুরে দলে দলে ইঁদুর খোলা রাস্তার উপর ছোটাছুটি করছে, অথবা ক্যাট মাছ হঠাৎ জল থেকে ঝাঁপিয়ে ডাঙায় উঠছে। যদি এমন ঘটে, সাবধান! বুঝতে হবে পায়ের নিচের মাটি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কেঁপে উঠবে।

চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গুয়াতেমালা, ইটালি— এমন অনেক দেশের মানুষ ভূমিকম্প হওয়ার কিছু আগে এবং ভূমিকম্পের সময় বিভিন্ন প্রাণীর আচরণে কত রকম কি ঘটে তার বিবরণ দিয়েছে বহুকাল হল। সে সব বিবরণ এখনও তারা বিশ্বাসও করে, তাদের কথাগুলি এক সঙ্গে করলে দাঁড়ায় ঃ ভূমিকম্প হবে অল্পক্ষণের মধ্যে, অথবা হচ্ছে, কী করে জানবে? দেখবে, সেই সময় পায়রা এবং মুরগী তাদের বাসার মুখে দলবদ্ধ হয়ে ভিড় করে শোরগোল তুলছে। গরুর মুখে অনবরত হাম্বা রব। পিঠে চাষীর মার পড়লেও তারা মাঠে যেতে চায় না। শহর বা গ্রামের সমস্ত কুকুর নাগাড়ে চিৎকার শুরু করে দেয়। গর্ত থেকে দলে দলে ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে বাইরে ছোটাছুটি করে। অথবা জলের মাছ লাফিয়ে ওঠে ডাঙায়। ঘোড়ারা চিৎকার করে, তাদের শরীর অদ্ভুত ভাবে কাঁপতে থাকে, খোঁয়াড় ছেড়ে তখন তারা বাইরে ছোটাছুটি করতে চায়। শীতের সময় গুঁটিশুঁটি মেরে গর্তের মধ্যে পড়ে থাকে সাপ। কিন্তু দেখা গেছে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা দেখা দিলেও প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করেও তারা গর্তের বাইরে বেরিয়ে এসে কখনও কখনও মাটির বুকে জমে থাকা বরফের উপর গড়াগড়ি খায়। এইভাবে কখনও কখনও তারা মৃত্যুও বরণ করে। প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের আচরণ দেখা যায় ভূমিকম্প হওয়ার কয়েক ঘণ্টা থেকে শুরু করে কয়েক ঘণ্টা আগে।

১৯৬৪ সালে বড় রকমের এক ভূমিকম্প ঘটে গেল আলাস্কায় একদিন। ওই অঞ্চলে বাস করে এক ধরনের ভালুক। নাম কোডিয়াক বিয়ার। শীতের সময় তারা থাকে গর্তে। সেদিনও ছিল শীত। হঠাৎ দেখা গেল সেদিন তার কেমন যেন অস্বস্তি নিয়ে দলে দলে গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুটে চলেছে কাছের এক পাহাড়ের দিকে। এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পর সেখানে ঘটল প্রচণ্ড ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬। এই ঘটনায় স্যাক্রামেন্টো থেকে প্রায় আশি মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ওরোভিল শহরটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৭৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি চীনের হাইচেং শহরে

যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় তারও পূর্বাভাস এইভাবেই পাওয়া গিয়েছিল। এ ব্যাপারে একজন চীনা বিশেষজ্ঞের বিবরণ শোন। বিবরণটি ছিল এই রকমঃ অদ্ভুত ব্যাপার। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ। ভীষণ শীতে হাইচেং শহর এবং তার আশপাশে তখন বরফের ছড়াছড়ি। হঠাৎ দেখা গেল বরফের উপর মরে পড়ে রয়েছে প্রচুর সাপ। বোঝা গেল সাপগুলি গর্ত থেকে বেরিয়ে বাইরে অতিরিক্ত শীতে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। পুরানো অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনুমান করলাম, আর কিছুই নয়, এ হল ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। সঙ্গে সঙ্গে শহরের সব মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হল। আর যা ভাবা গিয়েছিল, ঘটলও তাই। এল সেই অভিশপ্ত তারিখটি। ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫। সেদিন হাইচেং শহরে শুরু হল প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সেই কম্পনে পুরো শহরটাই ধ্বংস হয়ে গেল। ওই শহরে বাস করত দশ লক্ষ মানুষ। ভাগ্যি তাদের আগে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। নইলে কী হত, একবার ভাব দেখি?

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ভূমিকম্পের সময় ভূস্তরের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে। তাই প্রাণীদের আচরণ পাল্টানর ব্যাপারে এটাকে তাঁরা অন্যতম কারণ বলে মনে করেন।

বিভিন্ন প্রাণী—শিম্পাঞ্জি, ভালুক, মাছ, সাপ প্রভৃতি থেকে শুরু করে নানা রকম কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণার সাহায্যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস যোগান যায় কী না, সেটা তাঁরা খতিয়ে দেখছেন। এ ছাড়া আরও নানারকম পদ্ধতির কথাও ভাবা হচ্ছে। অনেকে আশা করছেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস যোগানর মত একদিন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস যোগানও হয়ত সম্ভব হবে। আর তা করা গেলে, মানুষ, গৃহপালিত প্রাণী এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও বাঁচান যাবে।

ছোটদের মনেরমত বই

মজার ছড়া
শ্রীভবানীপ্রসাদ মজুমদার
রঙীন ছবি [৫.০০]

মজার কবিতা
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
রঙীন ছবি [৫.০০]

কুমির সাহেব
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
বহু ছবি [৩.০০]

ছড়ার দেশে টুলটুলি
শ্রীশৈল চক্রবর্তী
লেখা ও রঙীন ছবি [৬.০০]

শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
রঙীন ছবি [৫.০০]

খাগড়াই
সুকুমার রায়ের ছড়ার সঙ্কলন
[৩.০০]

আষাঢ়ে স্বপ্ন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
বহু ছবি [৩.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

অনীশ দেব

শিক্ষক ও ছাত্র—আইনস্টাইনের চোখে

১৯৩৪ সালে একদল শিশুর কাছে এই বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আইনস্টাইন। মণিমুক্তোয় ভরা এই ছোট্ট বক্তব্য সত্যিই এক অমূল্য সম্পদ।

'প্রিয় শিশুরা,

রোদঝলমল ভাগ্যবান দেশের সুখী ভবিষ্যৎ তোমরা, তোমাদের কাছে পেয়ে আজ খুব ভালো লাগছে।

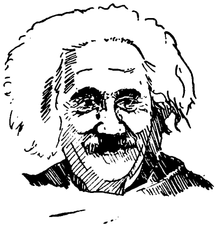

মনে রেখো, ইস্কুলে যে সব সুন্দর সুন্দর জিনিস তোমরা শেখো সেগুলো বহু শতাব্দীর ফসল; পৃথিবীর সব দেশের উৎসাহ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ফসল ফলেছে। এই অমূল্য জিনিস তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে, যাতে তোমরা একে গ্রহণ করতে পারো সম্মানের সঙ্গে, তিলে তিলে একে বাড়িয়ে তুলতে পারো আর একদিন বিশ্বাসের সঙ্গে দান করতে পারো তোমাদের ছেলেমেয়েদের। এইভাবে, সবাই মিলে যে সব স্থায়ী জিনিস আমরা সৃষ্টি করেছি, তারই মধ্যে অমর হয়ে থাকবো আমরা, মরণশীল মানুষেরা।

যদি এ কথা তোমরা সব সময় মনে রাখো, তাহলেই জীবন ও কাজের একটা অর্থ খুঁজে পাবে, এবং বিভিন্ন জাতি ও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।'

নিউটনের জীবনের শেষ সাতাশ বছর

তোমরা কি জানো, জীবনের শেষ সাতাশ বছরে উল্লেখ করার মতো কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিউটন করেন নি। ১৭০০ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের টাঁকশালে অধিকর্তা পদে নিযুক্ত হন। তারপর থেকে মুদ্রার কিছু কিছু উন্নতি সাধন করলেও বিজ্ঞান পিপাসুদের জন্য তেমন কিছু করেন নি। তবে জীবনের এই সময়ে আলোর প্রকৃতি নিয়ে চর্চা করেছিলেন নিউটন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এই বীতরাগ হওয়ার কারণ আজও আমাদের কাছে এক রহস্য।

আর্কিমিদিসের ইচ্ছে : পৃথিবী নিয়ে ছেলেখেলা

'শুধু আমাকে একটা দাঁড়াবার জায়গা দাও, তাহলে দেখবে আমি পৃথিবীকেও নড়িয়ে দিয়েছি!' প্রচলিত কিংবদন্তী বলে এই কথাগুলো প্রখ্যাত পদার্থবিদ আর্কিমিদিসের। লিভারের সূত্র আবিষ্কারের পর ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানী নাকি এই মন্তব্য করেছিলেন।

সাইরাকিউসের রাজা হিরোর আত্মীয় এবং বন্ধু ছিলেন আর্কিমিদিস। লিভারের সূত্র প্রসঙ্গে রাজাকে একটা চিঠি লিখতে গিয়ে তিনি এতো বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে বলে বসলেন, দাঁড়াবার জন্য আরেকটা পৃথিবী পেলে খুব সহজেই আমাদের পৃথিবীটাকে একটা লিভার দিয়ে তিনি শূন্যে তুলে ফেলতে পারবেন।

আর্কিমিদিসের একথা বলার কারণ, তিনি তখন বুঝতে পেরেছেন, সবচেয়ে ভারী জিনিসকেও লিভারের সাহায্যে সবচেয়ে কম বল প্রয়োগ করে তুলে ফেলা যায়। ফলে উনি ভেবেছেন, বিরাট লম্বা কোন লিভার দিয়ে পৃথিবীর মতো ভারী কোন জিনিসকেও খুব সহজেই তুলে ফেলা যাবে।

আমার মনে হয়, এই প্রতিভাধর মানুষটি যদি জানতেন পৃথিবীর ওজন কি সুবিশাল, তাহলে হয়তো নিজের কথাগুলো সটান গিলে ফেলতেন। কেন? সেটাই এবার দেখা যাক।

ধরো দাঁড়াবার জন্য আরেকটা 'পৃথিবী' দেওয়া হলো আর্কিমিদিসকে। একটা বিরাট লম্বা শক্ত-মজবুত লিভারও বানিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। এবার পৃথিবীর সমান ওজনের একটা বস্তু তাঁকে দেওয়া হলো যার আকার মোটামুটি ছোট—যাতে সেটা সহজেই লিভারের এক প্রান্তে বেঁধে দেওয়া যায়। এবার আন্দাজ করো দেখি, ঐ পৃথিবীর সমান ওজনের বস্তুটাকে ১ সে. মি নড়াতে

কতোক্ষণ সময় লাগবে আর্কিমিদিসের? মাত্র তিন কোটি বছর অর্থাৎ ৩×১০^{১৩} বছর (তিন সংখ্যাটার পর তেরোটা শূন্য বসালে যে সংখ্যা পাওয়া যায়)! বিশ্বাস করা কঠিন, কি বলো! এসো, তাহলে এবারে একটু অঙ্কের সাহায্য নেওয়া যাক।

ধরো, আর্কিমিদিস শুধু হাতে ৬০ কে. জি, ওজন তুলতে পারেন। আর আমরা জানি পৃথিবীর ওজন ৬×১০^{২৪} কে. জি। অতএব লিভারের সূত্র থেকে বলা যেতে পারে ছবিটা দেখে,

$$\frac{BF}{AF} = \frac{৬ \times ১০}{৬০} = ১০^{২৩}$$

অর্থাৎ লিভারের লম্বা বাহুর দৈর্ঘ্য খাটো বাহুর তুলনায় $১০^{২৩}$ গুণ হতে হবে। অতএব ছোট বাহু AF যদি ১ সে. মি নড়ে তাহলে BF বাহুর B বিন্দুকে নড়তে হবে $১০^{২৩}$ সে.মি বা $১০^{১৮}$ কি.মি। তাহলেই বুঝে দেখো, পৃথিবীকে মাত্র ১ সে.মি. নড়াতে গেলে আর্কিমিদিসকে অতিক্রম করতে হবে $১০^{১}$ কি.মি পথ। এই পথ পার হতে সময় লাগবে কতো? ধরে নাও, আর্কিমিদিস ৬০ কে. জি ওজনকে ১ মিটার তুলতে পারেন ১ সেকেণ্ডে। তাহলে $১০^{১৮}$ কি. মি পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগবে $১০^{২১}$ সেকেণ্ড বা তিন কোটি বছর! অর্থাৎ পৃথিবীকে ১ সে.মি তুলতে ঠিক ঐ সময়ই লাগবে। সুতরাং নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করলেও এ কাজ আর্কিমিদিসের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

এবারে একটা কাজ করা যাক ঐ ৬০ কে. জি. ওজন তোলার গতিবেগটা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে আর্কিমিদিসকে একটু সাহায্য করা যাক। আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে দ্রুতগতি কার? সহজ উত্তর: আলোর। প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কি.মি। এবার ধরো, আর্কিমিদিস আলোর সমান গতিবেগে ৬০ কে. জি ওজনটাকে $১০^{১৮}$ কি.মি. পথ অতিক্রম করালেন। তাহলেও তাঁর সময় লাগতো এক কোটি বছর! অর্থাৎ, আলোর গতিবেগ নিয়ে এক কোটি বছরের চেষ্টায় মাত্র ১ সে. মি নড়তো আমাদের এই পৃথিবী!

সুতরাং সব দেখে শুনে বলতে পারো, আর্কিমিদিস যে দাঁড়াবার জায়গা পাননি, সেটা তাঁর পক্ষে এক রকম ভালোই হয়েছে। নইলে শুধু শুধু তাঁকে এক কোটি বছর ধরে পরিশ্রম করতে হতো—অমর হলেও তিনি শান্তি পেতেন না।

উপহারের ভাবনা

বলতো দেখি একটা বছর পঞ্চাশেকের গাছের দাম কত? কাঠের দাম হিসেবে হয়তো দু'তিনশ টাকা, উঁহু হল না।

একটা পঞ্চাশ বছরের বড়সড় গাছ যার ওজন ধর পঞ্চাশ টনের মত হবে তার দাম ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বৈজ্ঞানিক ডাঃ তারক মোহন দাস (বালীগঞ্জ সাইন্স কলেজ) জানাচ্ছেন:

ঐরকম একটা গাছ অক্সিজেন তৈরী করে যার দাম	২,৫০,০০০ টাকা
জীবজন্তুর জন্য যে প্রোটিন দেয়	২০,০০০ „
মাটির ক্ষয় রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে	২,৫০,০০০ „
জলের আবর্তনচক্র ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	৩,০০,০০০ „
পাখি, পোকামাকড়, জীবজন্তু ও ছোটখাট উদ্ভিদের আশ্রয় হিসেবে	২,৫০,০০০ „
আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ	৫,০০,০০০ „
মোট	১৫,৭০,০০০ টাকা

তাহলেই দেখ শুধু ইচ্ছে করলেই একটা গাছ পুঁতে তোমরা কলকাতাকে অত বড় একটা উপহার দিতে পার! তোমরা যেমন বড় হবে, গাছটারও বয়স বাড়বে, এটা নিজের কাছে নিজের উপহার।

(সি, এম, ডি-এ জনসংযোগ বিভাগ,
৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭
হইতে প্রচারিত)

শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

একটা অদ্ভুত কৃস্ট্যাল থেকেই সব ঘটনার শুরু। কারণ কৃস্ট্যালের ভেতরে দেখা যাচ্ছে হুবহু মঙ্গল গ্রহের দৃশ্য। বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস এবং অমর বৈজ্ঞানিক প্রফেসর চ্যালেঞ্জার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর স্থির নিশ্চিত—যে, কৃস্ট্যালের ভেতরের দৃশ্য মঙ্গল গ্রহেরই দৃশ্য। হঠাৎই কৃস্ট্যালের ভেতর দেখা গেল—প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত। পৃথিবীর মানমন্দিরেও সেই সব দৃশ্য দেখা গেল মঙ্গলগ্রহের। কিন্তু এই কৃস্ট্যাল পৃথিবীতে এল কিভাবে? ওরা কে পৃথিবীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে? এরপর অগ্নিবর্ষণ কমে গেল—এবং শার্লক হোমস পেলেন একটি টেলিগ্রাফ পার্সি ফেল্পসের কাছ থেকে। বৈদেশিক দপ্তর থেকে অনুরোধ এসেছে-এক্ষুনি ওকিং যেতে হবে। কারণ, বিরাট একটা চোঙা পড়েছে ওখানে—এবং তার ভেতরে কী সব জীবন্ত প্রাণীও রয়েছে। মাঠের মাঝখানে পড়েছে চোঙাটা। চারপাশে কাতারে কাতারে লোক। প্রফেসর . চ্যালেঞ্জারও এসেছিলেন, কিন্তু জ্যোতির্বিদ স্টেন্টের সংগে প্রবল ঝগড়া করে ফিরে গেছেন। স্থানীয় মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ ওগিলভি, স্টেন্ট, ও একজন রিপোর্টার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, একটি সাদা পতাকা হাতে চোঙাটার কাছে এগিয়ে যাবেন—এবং জানতে চাইবেন ওদের উদ্দেশ্য কী?

আর তখনি ভয়াবহ ঘটানাটা ঘটল। দুটি আশ্চর্য জিনিস বেরিয়ে এল চোঙাটার ভেতর থেকে। একটি আয়নার মতো জিনিস লম্বা রডের সংগে যুক্ত। আর একটা সাপের ফণার মতো চ্যাটালো বস্তু। প্রতিনিধি দল আর একটু এগোতেই সহসা নীল বিদ্যুৎ ঝলক বেরিয়ে এসে তিনজনকেই পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিল। তারপর সেই নীল আলো ছুটে চলল আশেপাশের জনতার দিকে। বাড়ী ঘর মানুষজন পুড়িয়ে ছাই করে ফেলল। পার্সিকে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল হোমস পাশের মাঠে। মাথার উপর দিয়ে লেলিহান নীল আগুন ছুটে চলে গেল। বুকে হেঁটে জ্বলন্ত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দুই বন্ধু ওকিং গ্রামে ফিরে এল।

[সাত]

চলন্ত বয়লার

লণ্ডনে ফিরে এল শার্লক হোমস্ পরের দিন। বেকার স্ট্রীটের বাসায় এসে পেল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের একটা চিঠি!

মাইডিয়ার হোমস্,

মঙ্গলগ্রহের বিভীষিকাদের সঙ্গে মোকাবিলা আমিই করব। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো দরকার। এর জন্যে যদি আমার প্রাণ যায় যাক। তোমাকে টানতে চাই না। কারণ আমার চাইতে তোমার মগজ খুব বেশী নিকৃষ্ট নয়। আমি মরলে মঙ্গল বনাম পৃথিবী গ্রহের যুদ্ধে তোমার ব্রেন অনেক কাজ দেবে।

জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।

চিঠি পেয়েই জবাব লিখে এনমোর পার্কে চ্যালেঞ্জারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল হোমস্। লিখল, মঙ্গলগ্রহীদের ধ্বংসলীলা সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। মলঙ্গগ্রহীদের অবশ্য স্বচক্ষে দেখেনি—সে সুযোগও হয়নি। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে অভিযান আরম্ভ হল এবং ১৯০৪ সালে মঙ্গল যখন পৃথিবীর কাছে আসবে—তখন ওরা আসবে দলে দলে। ওদের চোখে পৃথিবী-বাসীরা কীটপতঙ্গের সামিল। তাই মানুষ নিকেশ করছে নির্মমভাবে। অথবা ব্যবহার করবে অন্য কোন ভাবে। তবে হ্যাঁ, আন্তঃগ্রহ যোগাযোগের যন্ত্র হিসেবে কৃস্টাল যন্ত্রটাকে যেন সযত্নে রাখা হয়। এ যন্ত্র ওরা হাতানোর চেষ্টা করতে পারে। তার আগে হোমস্ চেষ্টা করবে একটা মঙ্গলগ্রহীকে পাকড়াও করে গবেষণা করার—যাতে তাদের নিকেশ করার পথ বার করা যায়। হোমসের ধারণা, এ গ্রহে এসে নিজেদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গিয়ে একটু ঝামেলায় পড়তে পারে মঙ্গলের আতংকরা। চ্যালেঞ্জার যেন এই ধারণাটা নিয়ে তলিয়ে ভাবেন।

বিশেষ দূতের চিঠিখানা পাঠিয়ে সেদিনের খবরের কাগজ নিয়ে বসল হোমস্। গভর্নমেন্টের টনক নড়েছে। সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলের আতংকরা স্রেফ নীল বিদ্যুৎ অথবা তাপরশ্মি ছুঁড়ে সৈন্যদের ছাই করে দিচ্ছে! ওরা এবার গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বিরাটকায় চলন্ত বয়লারের মত যন্ত্রটা যেন রণপায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে! তিনটে ঠ্যাং তাদের। নীল বিদ্যুৎ ছুটছে বয়লারের মাথা থেকে। মাঝে মাঝে কালো ধোঁয়া। বিষ ধোঁয়া। মানুষ মরছে কাতারে কাতারে।

গতরাত্রে আবার একটা চোঙা খসে পড়েছে ঐ একই অঞ্চলে—মাইল তিনেক দূরে। প্রত্যেকটা চোঙার মধ্যে পাঁচজন মঙ্গলগ্রহী রয়েছে। রণপায়ে ভর-দেওয়া বয়লারের সংখ্যাও তাই। নীল বিদ্যুৎ ছুঁড়ে শ্মশানে পরিণত করছে তারা গোটা জেলাকে। একটা বয়লারকে কামান দেগে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বয়লাররা কামান-টামান সমেত গোটা সৈন্যবাহিনীকে ছাই করে দিয়েছে।

দাঁতে দাঁত পিষে হোমস্ বললে ল্যাণ্ডলেডী মিসেস হাডসনকে—মোট দশটা আগুনের ঝলক দেখা গিয়েছিল মঙ্গলের বুকে পর পর দশ রাতে। দুটো এসে পৌঁছেছে—আরও আটটা আসবে সামনের আটটা রাতে।

দম বন্ধ করা স্বরে মিসেস হাডসন বললে—আগুনের ঝলকগুলো তাহলে—

চোঙা পাঠানোর ঝলক। একটা করে চোঙাকে ওরা পাঠিয়েছে পৃথিবী লক্ষ্য করে এক-একরাতে। দুটো এসেছে, আরও আসছে।

খেয়ে উঠে ওয়াটসনের নামে চিঠি লিখে ম্যাণ্টলপিসে ছুরি দিয়ে গেঁথে আটকে রাখল হোমস্। ওয়াটসন গেছে লণ্ডনের বাইরে। ফিরে এসে সে পড়ুক শার্লক হোমসের শেষ কাহিনী—বোধহয় এই শেষ।

কেননা, পৃথিবীরও তো বোধহয় এই শেষ।

[আট]

কালো ধোঁয়া—উড়নচাকী

স্যার পার্সি হন্তদন্ত হয়ে এল পরদিন সকালে। সরকার বিরাট দায়িত্ব দিয়েছে শার্লক হোমস্‌কে। লণ্ডন ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এখানে থেকেই ভিনগ্রহী শত্রুদের গতিবিধি নজরে রাখতে হবে এবং লড়াইয়ের পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এ জন্যে এদেশের সর্বোচ্চ খেতাব দেওয়া হবে তাকে যথা সময়ে—নাইটহুড।

"অর্থাৎ স্যার শার্লক বলবে আমাকে সবাই এখন থেকে?" মৃদু হেসে বললে হোমস্।

"হ্যাঁ।"

মাথা নাড়ল শার্লক হোমস্—"আমি মিস্টার শার্লক হোমস্‌ই থাকতে চাই—স্যার শার্লক হতে চাই না। সরকার যে কাজ দিয়েছেন, তা দেশের কাজ। নিশ্চয় করব। তবে এখন আমাকে ডোর্মানিথর্প যেতে হচ্ছে।"

আঁৎকে উঠল স্যার পার্সি—"কেন?"

ল্যাণ্ডলেডী মিসেস হাডসনকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসব। ছোকরা চাকর বিলিকেও ছুটি দিয়েছি দেশে যাওয়ার জন্যে। লণ্ডন আর নিরাপদ নয়। ওদের দুটো সিলিণ্ডার নেমেছে সারে জেলায়। আমার বিশ্বাস, ফাঁকা জায়গায় নেমে ওরা আগে গুছিয়ে নেবে নিজেদের—তারপর পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম শহর লণ্ডনে হানা দেবে।"

স্যার পার্সি সায় দিয়ে বলল—"ঠিকই বলেছো। এই জন্যেই বোধহয় সরকার এখান থেকে দপ্তর ওঠাচ্ছেন।"

"ওঠাতেই হবে। কোথায় যাচ্ছে?"

বার্মিংহাম। হোমস্, দেশের জন্যে সমস্ত মানবজাতির জন্যে তোমার এখন লণ্ডনেই থাকা দরকার। হালচাল দেখে প্ল্যান ঠিক করা দরকার। তুমিই হবে সরকারের লণ্ডন পর্যবেক্ষক এই নাও তার নিয়োগপত্র।"

নিয়োগপত্রে চোখ বুলিয়ে কপাল কুঁচকে হোমস্ বললে—এ যে দেখছি বিরাট দায়িত্ব। ক্ষমতাও অসীম।"

"তাতো বটেই।"

"আমার দাদা মাইক্রফটকে বলো না।"

"তিনি রাজ পরিবারের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে ব্যালমোরাল কাসলে চলে গেছেন। হোমস্, তুমি ছাড়া এ দায়িত্ব নেওয়ার দ্বিতীয় লোক এ শহরে আর নেই।

"বুঝলাম। কিন্তু ডোর্মানিথর্প আমাকে যেতেই হবে। ফিরে এসে দেখব মঙ্গলগ্রহীদের হালচাল।"

মাঝরাতের ট্রেনে ডোর্মানিথর্প এসে পৌঁছোলো শার্লক হোমস্ মিসেস হাডসনকে নিয়ে। গাঁয়ের সরাইখানায় এখনো আলো জ্বলছে—দারুণ গুলতানি চলছে। গাঁয়ের জনাবারো মাতব্বর মিটিং করছেন অন্য গ্রহের আপদগুলোকে একহাত নেওয়ার ব্যাপারে।

খেতে খেতে শুনল হোমস্ সমবেত সিদ্ধান্ত। যে যেখান থেকে পারো, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হও—মারো মঙ্গলগ্রহীদের।

হাত তুলে বাধা দিল হোমস্।

বলল—বন্ধুগণ, উত্তেজিত হবেন না। সরকারের কামান বন্দুক হার মেনেছে যাদের কাছে—তাদের আপনারা গেঁইয়া হাতিয়ার নিয়ে আটকাতে পারবেন না। তাছাড়া, গুজব শুনছি ওরা নাকি নীল বিদ্যুৎ ছাড়াও এবার কালো-রঙের ধোঁয়া ছাড়ছে—আড়ালে লুকিয়ে থেকে যার বিষ-ক্রিয়া থেকে রক্ষে নেই।"

"তাহলে কি করতে বলেন?" বললেন মোড়লমশাই।

"চম্পট দিন। দেখলেই সরে পড়ুন—যদি প্রাণের মায়া থাকে।"

ঠিক এই সময়ে একটা টেলিগ্রাম এল হোমসের নামে। স্যার পার্সি পাঠিয়েছে বার্মিংহ্যাম থেকে। সারে জেলা থেকে টেম্‌স্ নদীর পাড় ধরে লণ্ডন পৌঁছেছে মঙ্গলগ্রহীরা। সৈন্যরা কাতারে কাতারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। মরেছে কত, সে হিসেবও পাওয়া যাচ্ছে না। সারে জেলাতে চতুর্থ চোঙা এসে পড়েছে। ধোঁয়া ছাড়ছে মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা। ঘন ধোঁয়া বেশ ভারী। মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। নাকে গেলেই প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহের চলন্ত মেশিন-গুলোই আবার বাষ্প ছুঁড়ে কালো ধোঁয়াকে কালচে পাউডার বানিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে তখন আর মানুষ মরছে না।

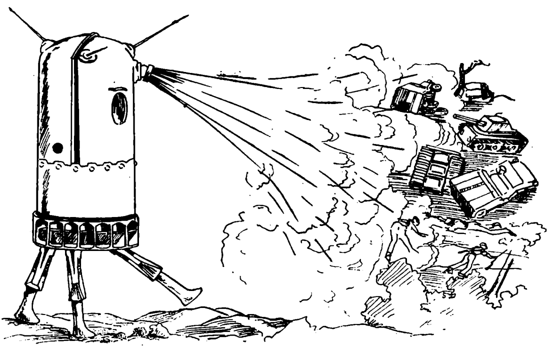

তীব্র নীল রশ্মি বেরিয়ে এসে চারপাশ পুড়িয়ে ফেলল......

ঘরে এসে টেলিগ্রামের জবাব লিখে পাঠাল হোম্‌স্। সাধু. সাবধান! চারটে চোঙা এসেছে—আরো ছ'টা আসছে। চারটেই পড়েছে সারে-তে বাকী ক'টাও কোথায় পড়বে, সে হিসেবও নিশ্চয় মঙ্গলগ্রহীরা করে রেখেছে। ওরা ইংল্যাণ্ডের বিশেষ এক জায়গাতেই শক্তি সংহত করছে মনে হচ্ছে। শুধু বুঝতে পারা যাচ্ছে না বাছাধনদের মতলবটা কী। মানুষ মেরে সাফ করতে চায়, না, টিঁকিয়ে রাখতে চায়।

টেলিগ্রাম পাঠানো ব্যবস্থা করে রাতটা সরাইখানাতেই কাটাল হোমস্। মিসেস্ হাডসন গেল নিজের বাড়িতে।

পরের দিন সকালে আরো খবর শোনা গেল সরাই-খানার মালিকের মুখে। পঙ্গপালের মত মানুষ ট্রেন বোঝাই হয়ে লণ্ডন থেকে চলে আসছে। সেখানে কালো

"যাক, তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল," বললে শার্লক হোম্‌স্। "মঙ্গলগ্রহীরা মানুষ মেরে পৃথিবী সাফ করতে চায় না। রুখে দাঁড়ালে কিছু লোক মারছে—তারপর নিজেরাই ধোঁয়ার বিষক্রিয়া নষ্ট করে দিচ্ছে। সেইসঙ্গে আবিষ্কার করা গেল কালো ধোঁয়াকে দরকার মত বাষ্প ছুঁড়ে নির্বিষ করারও পদ্ধতি।"

তৎক্ষণাৎ পোস্ট অফিসে গিয়ে টেলিগ্রামে পর্যবেক্ষণটা বার্মিংহামে স্যার পার্সির কাছে পাঠিয়ে দিল হোম্‌স্।

পরের দিন খবর এসে পৌঁছোলো কেম্ব্রিজ থেকে। একরাতেই দুটো চোঙা অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীতে। একটা সারে জেলাতেই—আর একটা খাস লণ্ডন শহরে—প্রিমরোজ পাহাড়ে।

খেতে খেতে এক ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করলেন

এই ব্যাপারে। চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর একটা করে চোঙা ছিটকে এসেছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। পৃথিবীতেও তাহলে চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর তাদের পৌঁছোনোর কথা। কিন্তু দু'টো চোঙা একই রাতে এল কিভাবে?

হোম্‌স্ বললে—"মশায়, মঙ্গলগ্রহীদের এই চোঙা-গুলোকে কামান থেকে ছোঁড়া গোলা বলে ভুল করবেন না। প্রতিটি চোঙা এক একটি মহাকাশযান। মহাশূন্যে নিজেদের গতি নিয়ন্ত্রণ, দিক পরিবর্তন এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবতরণের ক্ষমতা এদের আছে। তাই প্ল্যান মাফিক চোঙাগুলো কয়েক মাইল দূরে দূরে পড়ছে ইংল্যাণ্ডের একই অঞ্চলে।"

হাঁ করে শুনছিলেন ভদ্রলোক। দু'দিন আগে লণ্ডন থেকে ইনিই প্রাণ হাতে করে পালিয়ে এসেছেন। লণ্ডনে কালো ধোঁয়ার প্রতাপ স্বচক্ষে দেখেছেন, চলন্ত বয়লারের বিশাল মেশিনদেরও দেখেছেন। দেখেছেন নীল বিদ্যুতের মত মারাত্মক তাপরশ্মির ভয়াবহ লীলা।

তাই শার্লক হোমসের বিস্ময়ে শুনলেন দু'চোখ বড় বড় করে। শোনবার পর বললেন—"আপনি কি তাহলে বলছেন, কালো ধোঁয়া আর নীল বিদ্যুৎ দিয়ে হারাম-জাদারা শেষ করে ছাড়বে ইংল্যাণ্ডকে?"

হাসল হোম্‌স্। এক গরম খাবার মুখে তুলে চিবুতে চিবুতে বললে—"এবার আসছে বোধহয় তৃতীয় অস্ত্র।"

"তৃতীয় অস্ত্র!"

"মাত্র চারটে চোঙার ভেল্কি আমরা এতদিন দেখেছি—নীল বিদ্যুৎ প্রথমে, কালো ধোঁয়া তারপরে। আরও চোঙা আসছে—নামাচ্ছে আরো যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র—যা প্রথমে আনা যায় নি। এবার সেইসব যন্ত্রপাতি জোড়া লাগিয়ে তৃতীয় অস্ত্র বানানো কি অসম্ভব? এমন কোনো অস্ত্র যা কালো ধোঁয়া, নীল বিদ্যুৎ আর চলন্ত বয়লারদের চেয়েও দ্রুতগতি হবে—পুরো দেশটাকে আরো তাড়াতাড়ি কব্জায় আনবে—তারপর সমস্ত পৃথিবীকে?"

খাবি খেতে খেতে লণ্ডন থেকে পলাতক ভয়ার্ত ভদ্রলোক বললেন—"মিস্টার হোম্‌স্, আপনি যেন ওদের অস্ত্রাগারটা এইমাত্র দেখে এসে কথা বলছেন। অথচ যা বলছেন, তা উড়িয়ে দেওয়ার মত অযৌক্তিকও নয়। কি মনে হয় আপনার? তৃতীয় অস্ত্রটা কি হতে পারে?

"উড়ুক্কু মেশিন।"

"অসম্ভব!"

"অসম্ভব আমাদের কাছে—ওদের কাছে নয়! যারা এত লক্ষ মাইল অক্লেশে উড়ে এসে পৃথিবীতে আসন গেড়ে বসেছে—তাদের পক্ষে পৃথিবীর আকাশে উড়ুক্কু মেশিন উড়িয়ে দেওয়া এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়।"

লণ্ডনগামী ট্রেনের একটা কামরায় দেখা গেল শার্লক হোমসকে এর পরের দিন। মাথায় চেক টুপী। গায়ে চেক কোট—যেন তদন্তে চলেছে।

ট্রেন ফাঁকা। লণ্ডনের দিকে যাওয়ার লোক নেই ভলান্টিয়ার ছাড়া। শুকনো মুখে এদের একজন কেউ হোমসকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করেছিল—তদন্তে চললেন নাকি মিস্টার হোমস্?"

হোমস্‌ও জবাবটা দিয়েছিল তক্ষুণি—"তদন্তই তো। বিশ্বের বৃহত্তম তদন্ত। বৃহত্তম ক্রাইম অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহির্বিশ্ব থেকে তারই তদন্ত।"

ভলান্টিয়ার ভদ্রলোকের প্রাণটা এমনিতেই গলায় এসে ঠেকেছিল নিদারুণ এ উৎকণ্ঠায়। হোমসের স্মিত মুখের রসিকতায় ভাষা খুঁজে পায়নি।

ট্রেন কিন্তু লণ্ডন পৌঁছোনোর আগেই একটা ঘটনা ঘটল।

আচম্বিতে একটা ছায়া এসে পড়ল চলন্ত ট্রেন আর তার পাশে। উড়ন্ত কিছুর ছায়া। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল হোমস্। তারপর তাকাল আকাশ পানে। চেয়ে রইল একদৃষ্টে। নিঃশব্দ চোখে। তার তৃতীয় অনুমানও সত্যি হল তাহলে -

ক্রমশঃ

রসায়নের সহজপাঠ

অমরনাথ রায়

বিভিন্ন পরমাণুর তাড়িত ঋণাত্মকতা তুলনা করার জন্যে হাইড্রোজেনের তাড়িত ঋণাত্মকতার মান ধরা হয় 2.1 এবং এর ভিত্তিতে অন্যান্য পরমাণুর তাড়িত ঋণাত্মকতার মান নির্ণয় করা হয়। নীচে সেই মানগুলি দেওয়া হলো।

$H = 2.1$

Li = 1.0	Na = 0.9	K = 0.8	Rb = 0.8	Cs = 0.7
Be = 1.5	Mg = 1.2	Ca = 1.0	Sr = 1.0	Be = 0.9
B = 2.0	Al = 1.5	Se = 2.4	I = 2.4	
C = 2.5	Si = 1.8	Br = 2.8		
N = 3.0	P = 2.1			
O = 3.5	S = 2.5			
F = 4.0	Cl = 3.0			

এর থেকে দেখা যায় যে, তাড়িত ঋণাত্মকতা সিজিয়ামের সবচেয়ে কম (0.7) এবং ফ্লোরিনের সবচেয়ে বেশী (4.0)।

তাড়িৎ যোজ্যতা ঃ

কতকগুলি ক্ষেত্রে দু'টি পরমাণুর মিলনের সময় একটি পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন অন্য পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয়। একটি পরমাণু তার সবচেয়ে বাইরের কক্ষ থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বর্জন করে। অন্য পরমাণুটি সেই ইলেকট্রন গ্রহণ ক'রে নিজের সবচেয়ে বাইরের কক্ষে ধরে রাখে। পরমাণু দু'টির এই ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া এমনভাবে ঘটে যে, এর ফলে উভয় পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর কাঠামো পায় অর্থাৎ উভয় পরমাণুই সবচেয়ে বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রনে ভর্তি হয়ে যায়।

দেখা গেছে যে, ধাতব মৌলগুলির পরমাণুর শেষ স্তরে কম সংখ্যক (1, 2 কিংবা 3) ইলেকট্রন থাকে। এই মৌলগুলি খুব সহজেই শেষ স্তরের ইলেকট্রন অন্য পরমাণুকে দান ক'রে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পায়। অন্যদিকে অধাতুগুলির শেষ বা সর্ব বহিঃস্থ স্তরে বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। দু' একটি ইলেকট্রন পেলেই এরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পায়। সেইজন্যে অন্য পরমাণু থেকে এক বা তার বেশী ইলেকট্রন গ্রহণ ক'রে অধাতব মৌলগুলির পরমাণু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে।

সাধারণ নিয়মে ধাতুর পরমাণু ইলেকট্রন বর্জন করে এবং অধাতুর পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান সমান হওয়ায় পরমাণু নিস্তড়িত হয়। এখন কোন পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন চলে যাওয়ার ফলে পরমাণুটি ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। আবার ঐ ইলেকট্রন কোন পরমাণু গ্রহণ করার ফলে ঐ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পরমাণুটি ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। **তড়িৎগ্রস্ত এই কণাগুলিকেই আয়ন বলে।**

—এইভাবে যে বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত আয়নের সৃষ্টি হয়, তারা পরস্পরের তড়িতাকর্ষণে মিলিত হ'য়ে যৌগিক অণুর সৃষ্টি করে। কাজেই বলা যায়—

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মত ইলেকট্রন বিন্যাস গঠন করার চেষ্টায় একটি পরমাণুর সর্ব বহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন অন্য পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রন স্তরে স্থানান্তরিত হ'য়ে তড়িৎ আকর্ষণের সাহায্যে যৌগ গঠনের ক্ষমতাকে বলা হয় ইলেকট্রনীয় যোজ্যতা (Electro valency)।

যে যৌগ এইভাবে উৎপন্ন হয়, তাকে তড়িৎযোজী (Electro valent) যৌগ বলে।

যৌগ গঠনের সময় একটি পরমাণু যত সংখ্যক ইলেকট্রন ত্যাগ করে বা গ্রহণ করে, সেই সংখ্যা দ্বারাই এই পরমাণুর তড়িৎ-যোজ্যতা পরিমাপ করা হয়। যেমন Ca পরমাণুর সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তরে 2টি ইলেকট্রন আছে (2, 8, 8, 2)। যৌগ গঠনের সময় Ca পরমাণু এই ইলেকট্রন দু'টি ত্যাগ করে। অতএব Ca পরমাণুর তড়িৎ যোজ্যতা 2.

উদাহরণ (i)→ সোডিয়াম ক্লোরাইড অণুর গঠন।

সোডিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 11টি প্রোটন ও 12টি নিউট্রন আছে। পরমাণুটির ইলেকট্রন বিন্যাস (2, 8, 1)। এই পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষে (M কক্ষে) মাত্র 1টি ইলেকট্রন আছে। আবার ক্লোরিন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 17টি প্রোটন ও 18টি নিউট্রন

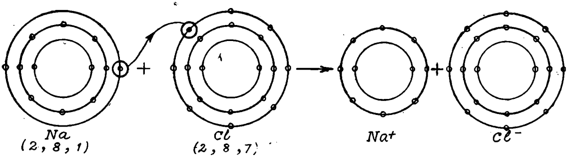

আছে। ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো (2, 8, 7)। এখন উভয় পরমাণু চায় বাইরের কক্ষে ৪টি (আটটি) ইলেকট্রন রাখতে। এই দু'টি পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগ ঘটার সময় সোডিয়াম পরমাণু নিজের সবচেয়ে বাইরের কক্ষের 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে। ফলে পরমাণুটি Na^+ আয়নে পরিণত হয়।

ক্লোরিন পরমাণু ঐ ইলেকট্রনটি নিজের সবচেয়ে বাইরের কক্ষে গ্রহণ ক'রে Cl^- আয়নে পরিণত হয়।

এইভাবে ইলেকট্রন আদান-প্রদান হওয়ায় Na পরমাণুর L কক্ষটি (দ্বিতীয় কক্ষটি) সর্ববহিঃস্থ কক্ষে পরিণত হয়। তখন ঐ কক্ষে ৪টি (আটটি) ইলেকট্রন থাকে। Cl পরমাণুর সর্বশেষ স্তরে 7টি ইলেকট্রন ছিল। এখন Na পরমাণুর 1টি ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ায় Cl পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা দাঁড়ায় আট।— এইভাবে উৎপন্ন Na^+ এবং Cl^- আয়নগুলি তড়িৎ আকর্ষণে পরস্পর যুক্ত হ'য়ে NaCl অণু গঠন করে।

অতএব NaCl তড়িৎযোজী যৌগ। একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করায় সোডিয়ামের তড়িৎ যোজ্যতা = 1. ক্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করায় এর তড়িৎ যোজ্যতা = 1.

নীচে আরও একটি তড়িৎ যোজ্যতার উদাহরণ দেওয়া হলো। এতে পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ (ii) :—

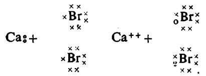

অর্থাৎ

$$\underset{(2,8,8,2)}{Ca} + \underset{2(2,8,18,17)}{2\,Br} = \underset{(2,8,8)}{Ca^{++}} + \underset{2(2,8,18,8)}{2Br^-} \rightarrow CaBr_2$$

এই রকম আরও কয়েকটি উদাহরণ দিলে দেখা যাবে যে প্রতি ক্ষেত্রেই রাসায়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আয়নের শেষ স্তরে আটটি ক'রে ইলেকট্রন থাকে। এর ফলে প্রত্যেকটি আয়নই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো পায়। সেই কারণে আয়নগুলি সুস্থিত হয় এবং আয়নের ধর্ম পরমাণুর ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়।

সমযোজ্যতা :

অনেক সময় একই মৌলের কিংবা বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলি অন্যভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। দু'টি পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষ থেকে সমসংখ্যক ইলেকট্রন এসে এক বা একাধিক ইলেকট্রন জোড় সৃষ্টি করে। উভয় পরমাণুর মধ্যেই এই ইলেকট্রন জোড় সাধারণ (common) রূপে থেকে পরমাণু দু'টির রাসায়নিক মিলন ঘটায়। এই ইলেকট্রন জোড়কে প্রত্যেক পরমাণুরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যায়।—এইভাবে মৌলিক বা যৌগিক অণু গঠনের সময় এক বা একাধিক ইলেকট্রন জোড়কে দু'টি পরমাণু সমভাবে ব্যবহার করার ফলে উভয় পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো সুস্থিত কাঠামো লাভ করে। তবে এ ক্ষেত্রে এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় না বলে পরমাণু দু'টির তড়িৎ আধান মাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না।

কাজেই সমযোজ্যতার সংজ্ঞা হলো এই রকম : **"নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর মতো সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের প্রচেষ্টায় দু'টি পরমাণুর মধ্যে এক বা একাধিক**

ইলেকট্রন জোড় সমভাবে ব্যবহৃত হ'য়ে এই পরমাণু দু'টির রাসায়নিক মিলন ঘটাবার ক্ষমতাকে 'সমযোজ্যতা' বলে। সমযোজ্যতার দ্বারা যে পদার্থ গঠিত হয় তার নাম 'সমযোজী পদার্থ' (covalent compound)।

ইলেকট্রন জোড়ের সংখ্যা দ্বারা সমযোজী পদার্থের অন্তর্গত মৌলের যোজ্যতার পরিমাপ করা হয়। দু'টি পরমাণু প্রত্যেকে একটি ক'রে ইলেকট্রন দান ক'রে যখন পরস্পরের মধ্যে একটি ইলেকট্রন জোড় গঠন করে তখন পরমাণু দু'টির মধ্যে একযোজী বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এই জন্যে এক-একটি ইলেকট্রন জোড়কে '—' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অপরপক্ষে দু'টি পরমাণু যখন দু'টি ইলেকট্রন জোড় গঠন করে তখন পরমাণু দু'টির মধ্যে দ্বিযোজী বন্ধনের এবং তিনটি ইলেকট্রন জোড় গঠন করলে ত্রিযোজী বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এদের যথাক্রমে (=) এবং (≡) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে সমযোজ্যতার ধারণাটা স্পষ্ট হবে।

উদাহরণ (i) : নাইট্রোজেন অণু গঠন

নাইট্রোজেন পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষে পাঁচটি ইলেকট্রন আছে। নাইট্রোজেন অণু গঠনের সময় দু'টি N পরমাণুর প্রত্যেকে তিনটি ক'রে ইলেকট্রন দিয়ে তিনটি ইলেকট্রন জোড় গঠন ক'রে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে। তিনটি ইলেকট্রন জোড় গঠন করার জন্যে N-এর যোজ্যতা = 3.

$$\cdot\ddot{N}\cdot + \cdot\ddot{N}\cdot \rightarrow :N\vdots\vdots N: \text{ বা } : \equiv N:$$

উদাহরণ (ii) : মিথেন অণু গঠন

কার্বন পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরে 4টি ইলেকট্রন থাকে। এই 4টি ইলেকট্রন 4টি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি করে ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলে 4টি ইলেকট্রন জোড় গঠন করে। তার ফলে কার্বন পরমাণু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে।

$$4H\times + \cdot\dot{C}\cdot \rightarrow H\overset{\times}{\circ}\overset{H}{\underset{H}{C}}\overset{\times}{\circ}H \text{ বা } H-\overset{H}{\underset{H}{C}}-H$$

উদাহরণ (iii) : অ্যাসিটিলিন অণু গঠন

$$H\overset{\times}{\circ}C\vdots\vdots C\overset{\times}{\circ}H \text{ বা } H-C\equiv C-H$$

(অ্যাসিটিলিন)

উদাহরণ (iv) : ইথিলিন অণু গঠন

$$H\overset{\times}{\circ}\underset{H}{C}::\underset{H}{C}\overset{\times}{\circ}H \text{ বা } H-\overset{H}{C}-\overset{H}{C}-H$$

(ইথিলিন)

অসম যোজ্যতা :

দু'টি পরমাণু যখন সমযোজ্যতার দ্বারা যুক্ত হয়, তখন প্রত্যেকটি পরমাণু থেকে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন এসে পরমাণু দু'টির মধ্যে বন্ধনের সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উভয় পরমাণুর বন্ধনের জন্যে যে ইলেকট্রন যুগল দরকার তা একটি পরমাণু থেকেই আসে। অপর পরমাণুটি কোন ইলেকট্রন দেয় না অথচ দু'টি পরমাণুই এই ইলেকট্রন জোড়ের উপর সমান অধিকার লাভ করে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন দু'টি সমযোজকের কাজ করে। এই দু'টি পরমাণুর এই রকম সংযোগের ফলে যে বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তারই নাম 'অসম-যোজ্যতা' (Co-ordinate Covalency)।

অসমযোজ্যতার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে :

"যে যোজ্যতার সাহায্যে একটি পরমাণু অপর একটি পরমাণুর দান করা ইলেকট্রন জোড়ের অংশভাগী হ'য়ে আপন সর্ববহিঃস্থ কক্ষের সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে তাকে অসমযোজ্যতা বলা হয়।"

অসমযোজ্যতার ক্ষেত্রে যে পরমাণু ইলেকট্রন যুগল যোগায় তাকে 'দাতা' (donor) এবং যে পরমাণু ঐ ইলেকট্রন যুগল গ্রহণ করে তাকে 'গ্রহীতা' (acceptor) বলা হয়।

অসমযোজ্যতা নির্দেশ করতে তীরচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সেই তীরচিহ্নের অগ্রভাগ গ্রহীতার দিকে এবং পশ্চাদ্‌ভাগ দাতার দিকে থাকে।

A : + C = A : C বা A→C (এখানে A দাতা এবং C গ্রহীতা। A একাই দু'টি ইলেকট্রন দান ক'রে অসমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করেছে।)

অসমযোজ্যতার দ্বারা রাসায়নিক সংযোগের প্রধান শর্ত হলো এই যে—অংশগ্রহণকারী একটি পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষে কমপক্ষে একটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল থাকতে হবে। 'নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল' মানে এমন এক জোড়া ইলেকট্রন, যা কোনভাবে অপরের সঙ্গে যুক্ত নয়। আবার অপর পরমাণুটিরও সবচেয়ে বাইরের কক্ষে দু'টি ইলেকট্রন গ্রহণ করবার মত স্থান থাকা দরকার।

নীচের ছবিটি দেখলে বোঝা যাবে অ্যামোনিয়ার একটি অণুতে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগলের অবস্থান কোথায়।

$$\begin{array}{c} H \\ H\overset{\times\circ}{:}\ddot{N}: \\ \underset{\circ}{\times} \\ H \end{array} \leftarrow \text{নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনযুগল।}$$

এবার অসমযোজ্যতার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

উদাহরণ (i) : অ্যামোনিয়াম আয়ন গঠন।

$$\begin{array}{c} H \\ H:\ddot{N}: \\ \ddot{H} \end{array} + H^{+} \rightarrow \left[\begin{array}{c} H \\ H:\ddot{N}:H \\ \ddot{H} \end{array}\right]^{+} \text{ বা } (NH_4)^{+} \text{ (অ্যামোনিয়াম আয়ন)}$$

উদাহরণ (ii) : ওজোন অণুর গঠন।

$$:\overset{\circ}{O}: \overset{\times\times}{\underset{\times}{\times}O\times} + \ddot{O}: \rightarrow :\ddot{O}: \overset{\times\times}{\times O\times} \ddot{O}:$$

(ওজোন অণু)

অথবা [$O = O \rightarrow O$]

উদাহরণ (iii) : সালফার ডাই-অক্সাইড অণুর গঠন।

অষ্টক পূর্ণ করার পর S পরমাণুতে একটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনযুগল থেকে যায়। এই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনযুগল O পরমাণু গ্রহণ করে।

$$:\ddot{O}: \overset{\times}{\underset{\times}{\times}S\times} + \ddot{O}: \rightarrow :\ddot{O}: \overset{\times}{\underset{\times}{\times}S\times} \ddot{O}: \rightarrow [O = S \rightarrow O]$$

সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য :

(i) সমযোজী যৌগ তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না এবং দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিত হয় না।

(ii) সমযোজী যৌগগুলি সাধারণতঃ তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ।

(iii) অণু-অণুর বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল হওয়ায় সমযোজী যৌগগুলির গলনাংক ও স্ফুটনাংক অনেক কম হয় এবং একটি অণু থেকে অপর অণুকে পৃথক করতে কম শক্তি লাগে।

(iv) সমযোজী যৌগগুলি অণু দ্বারা গঠিত কেলাস উৎপন্ন করে।

(v) সমযোজী যৌগগুলি ইথার, বেঞ্জিন ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।

তড়িৎযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য :

(i) তড়িৎযোজী যৌগগুলি গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নিত হয় ও তড়িৎ পরিবাহী হয়।

(ii) তড়িৎযোজী যৌগগুলি সাধারণতঃ কঠিন পদার্থ হয়।

(iii) এই শ্রেণীর যৌগের অণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ তীব্র হওয়ায় এদের গলনাংক ও স্ফুটনাংক বেশী হয় এবং এরা অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী হয়।

(iv) তড়িৎযোজী যৌগগুলি আয়ন দ্বারা গঠিত কেলাস উৎপন্ন করে।

(v) এই শ্রেণীর যৌগগুলি সাধারণতঃ জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু জল, অ্যালকোহল ইত্যাদি ধ্রুবীয় (polar) দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।

অসমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য :

(i) অসমযোজী যৌগগুলি জলীয় দ্রবণে আয়নিত হয় না, তবে তড়িৎযোজী যৌগে অসমযোজী মূলক থাকলে মূলকটি সামগ্রিকভাবে আয়নে পরিণত হয়।

(ii) এই শ্রেণীর যৌগগুলির গলনাংক ও স্ফুটনাংক সমযোজী যৌগের চেয়ে সাধারণতঃ বেশী হয়, কিন্তু তড়িৎযোজী যৌগের চেয়ে কম হয়। কয়েকটি অণু (NH_3, BF_3) এবং আয়ন (NH_4^+, BF_4^-) অসমযোজ্যতা দ্বারা যৌগ উৎপন্ন করতে পারে।

আবেগ বডল্যান্ডার-এর নিয়ম (Abegg and Bodlander's Rule) :

তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবর্তনশীল যোজ্যতার কথা বলা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে সালফার, নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতি অধাতব মৌল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে সংযোগকালে পৃথক পৃথক যোজ্যতা দেখায়। যেমন, H_2S (হাইড্রোজেন সালফাইড) যৌগে S-এর যোজ্যতা = 2, কিন্তু SO_2 (সালফার ডাই-অক্সাইড) যৌগে S-এর যোজ্যতা = 4. আবার SO_3 (সালফার ট্রাই-অক্সাইড) যৌগে S-এর যোজ্যতা = 6. এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সালফারের হাইড্রোজেন—যোজ্যতা H_2S যৌগে 2 এবং অক্সিজেন-যোজ্যতা SO_3 যৌগে 6. আবেগ-বডল্যাণ্ডার এর নিয়ম অনুসারে সালফারের হাইড্রোজেন-যোজ্যতা ও অক্সিজেন-যোজ্যতার যোগফল হবে আট।

আরও কয়েকটা উদাহরণ দিলে এই নিয়মটা ভালভাবে বোঝা যাবে।

NH_3 যৌগে N-এর হাইড্রোজেন-যোজ্যতা = 3 N_2O_5 যৌগে N-এর অক্সিজেন-যোজ্যতা = 5	উভয় যোজ্যতার যোগফল $3+5=8$
PH_3 যৌগে P-এর হাইড্রোজেন-যোজ্যতা = 3 P_2O_5 যৌগে P-এর অক্সিজেন-যোজ্যতা = 5	উভয় যোজ্যতার যোগফল $3+5=8$
HCl যৌগে Cl-এর হাইড্রোজেন-যোজ্যতা = 1 Cl_2O_7 যৌগে Cl-এর অক্সিজেন-যোজ্যতা = 7	উভয় যোজ্যতার যোগফল $1+7=8$

অতএব "পরিবর্তনশীল যোজ্যতা সম্পন্ন কোন মৌল যদি পৃথকভাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন - উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, তবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযোগের সময় মৌলটির নিম্নতম যোজ্যতা এবং অক্সিজেনের সঙ্গে সংযোগের সময় উচ্চতম যোজ্যতা প্রকাশ পায়। এই দুই যোজ্যতার যোগফল সাধারণতঃ আট (8) হয়। এইটাই আবেগ-বডল্যান্ডার-এর নিয়ম।"

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. চারটি অজৈব লবণের নাম লেখ এবং প্রতিটি লবণের ক্ষারকীয় ও আম্লিক মূলকগুলি নির্দেশ কর।

2. সরল মূলক ও যৌগ মূলক বলতে কি বোঝ তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

3. 'আয়ন' কাকে বলে? ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন বলতে কি বোঝ?

4. পাঁচটি তড়িৎ ধনাত্মক ও পাঁচটি তড়িৎ ঋণাত্মক মূলকের নাম লেখ।

5. নিম্নলিখিত ক্ষারকীয় মূলকগুলির চিহ্ন ও তড়িৎ যোজ্যতা নির্দেশ কর:

কিউপ্রাস, মারকিউরিক, স্ট্যানাস, ফেরিক, প্লাম্বিক ও আর্সেনিক।

6. নিম্নলিখিত তড়িৎ ঋণাত্মক মূলকগুলির চিহ্ন/সংকেত এবং তাড়িৎযোজ্যতা নির্দেশ কর:

বাই সালফেট, পার ক্লোরেট, নাইট্রাইট, ক্রোমেট, সালফেট, অ্যালুমিনেট, ফসফেট, ফেরোসায়ানাইড।

7. পজিটিভ ও নেগেটিভ যোজ্যতা বলতে কি বোঝ?

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টির পজিটিভ ও কোন্‌টির নেগেটিভ যোজ্যতা বর্তমান এবং সেই যোজ্যতার মান কতো তা লেখ।

Ca, OH, NH_4, O, NO_3

8. সক্রিয় ও সুপ্ত যোজ্যতা বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য ব্যাখ্যা কর।

9. 'তাড়িত ঋণাত্মকতা' বলতে কি বোঝ? কোন্ মৌলের তাড়িত ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে কম? কোন্ মৌলের ক্ষেত্রে এর মান সবচেয়ে বেশী?

10. উদাহরণ সহযোগে 'তড়িৎ যোজ্যতা' ব্যাখ্যা কর। কয়েকটি তড়িতযোজী যৌগের নাম লেখ।

11. উদাহরণ সহযোগে 'সমযোজ্যতা' ব্যাখ্যা কর। কয়েকটি সমযোজী যৌগের নাম লেখ।

12. অসমযোজ্যতার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

13. সমযোজী ও তড়িৎযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

14. আবেগ-বডল্যাণ্ডার এর নিয়মটি লেখ। দু'টি উদাহরণ উল্লেখ ক'রে এই নিয়মটির সত্যতা প্রমাণ কর।

15. তড়িৎযোজী যৌগের গলনাংক ও স্ফুটনাংক বেশী হয় কেন?

16. যোজ্যতার চিহ্ন ব্যবহার ক'রে ওজোন অণুর গঠন ব্যাখ্যা কর। এটি কি ধরনের যোজ্যতার উদাহরণ?

17. সমযোজ্যতা ও অসমযোজ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি?

18. নিম্নলিখিত মৌলগুলির মধ্যে কোন্‌টির তাড়িত-ঋণাত্মকতা কতো?

Li, O, S, Br, Sr, Be, Mg, Na.

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন

বিমলেন্দু মিত্র

সেই প্রাচীনকালেই গ্রীসদেশ স্থাপত্য আর ইঞ্জিনীয়ারিং-এ সেরা হয়ে উঠেছিল। গ্রীক মন্দির টন্দিরে সারি সারি মোটা মোটা থাম থাকত। ঐ স্টাইল পরে রোমানরাও নিয়েছিল। গ্রীকদের চাঁছাছোলা শক্ত-সমর্থ অথচ সুন্দর 'ডোরিক' স্টাইলের থাম মাথার দিকে ফুলের তোড়ার মত কারুকার্য করা. খাঁজকাটা-গা 'কোরিন্থিয়ানে' দাঁড়াল। তোমরা যদি পঞ্চাশ ষাট বছর আগে জন্মাতে, তবে কোলকাতাতেও নকল ডোরিক কিংবা কোরিন্থিয়ান থামওয়ালা অপূর্ব সুন্দর গ্রীক মন্দিরের মত করে তৈরি অনেক বড় বড় বাড়ি দেখতে পেতে। সেরকম অনেক বাড়িই এখন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। গোলদীঘির সামনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট হল' ছিল কোরিন্থিয়ান থামওয়ালা আশ্চর্য সুন্দর বাড়ি, যেটি ভেঙ্গে দেওয়ার দুঃখ আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি। এখন যেখানে "গোয়েঙ্কা কলেজ অব্ কমার্স" হয়েছে, ঠিক সেখানেই ছিল আর একটি ছোট্ট, সুন্দর, থামওয়ালা বাড়ি, ২১০নং বৌবাজার স্ট্রীট। সেই বাড়িটিতে ছিল ভারতের সবচেয়ে পুরনো বিজ্ঞানের গবেষণাগার, "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টি-ভেশান অব্ সায়েন্স"। একশো বছরেরও বেশি হল ওটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। গবেষণাগারটি বড় হয়েছে, আর চলে গেছে যাদবপুরে। কিন্তু পুরনো বাড়িটি স্রেফ এই কারণেই ভেঙ্গে ফেলা উচিত হয় নি যে—এই বাড়িতে বসেই কাজ করে স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন বিখ্যাত 'রামন-প্রভব' বা 'রামন-এফেক্ট্' আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার ভারতবর্ষকে প্রথম বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ এনে দেয়,—প্রথম ও এখনও পর্যন্ত অদ্বিতীয়। রামন-প্রভব এমন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যার গুরুত্ব আজও সমানভাবেই রয়েছে। আজকাল লেসার রশ্মি আবিষ্কার হওয়ার ফলে ঐ আলো দিয়ে রামন-প্রভবের পরীক্ষা পরমাণুবিদ্যার নতুন কারিগরী দাঁড়িয়ে গেছে।

চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ১৮৮৮ সালের ৭ই নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের তিরুচিরপল্লীতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন পদার্থবিদ্যা আর অঙ্কের অধ্যাপক। ছোটবেলা থেকেই চন্দ্রশেখর ছিলেন দারুণ মেধাবী ছাত্র। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই ম্যাট্রিক পাশ করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি. এস-সি. ও এম. এস-সি পাশ করলেন। ছাত্র অবস্থাতেই মৌলিক গবেষণা করে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পাশ করে বিলেত যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল খারাপ,—ডাক্তার বিলেত যেতে বারণ করলেন। অনেক পরে, রামন যখন অনেক বড় হয়েছেন, তিনি ঠাট্টা করে বলতেন—তিনি যা হয়েছেন তার পেছনে ঐ ইংরেজ ডাক্তারটির হাত কম নেই, কারণ সে সময়ে বিলেত গেলে হয়তো রামন-প্রভব আবিষ্কার করা হত না! বিলেত না গেলেও তাঁর মত ভাল ছাত্র চট্ করে সরকারী চাকরী পেয়ে গেলেন,—সরকারী হিসেব বিভাগে। চাকরী সূত্রে বদলী হলেন কোলকাতায়।

কোলকাতায় তিনি যেন ঠিক নিজের মনের মত জগৎ পেলেন। ২১০নং বৌবাজার স্ট্রীটের ল্যাবরেটরীতে যোগ দিলেন—অফিসে যাওয়ার আগে সকালে আর অফিস থেকে ফিরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেখানেই তাঁর কাটত। আস্তে আস্তে ল্যাবরেটরীটিকেও তিনি মনের মত করে গড়ে নিতে লাগলেন। তাঁর গবেষণা ছিল আলোক-বিজ্ঞান ও শব্দ-বিজ্ঞান নিয়ে। এই সময়ে আবার একটু মুস্কিল হল, গভর্নমেণ্ট তাঁকে রেঙ্গুনে বদলী করলেন। কিন্তু কিছু পরেই তাঁর বাবা মারা যেতে উনি মাদ্রাজে ফিরলেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন খুবই নামডাক। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলার। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল ভাল ভাল ছাত্রদের নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে দেওয়া যাতে কোলকাতার পড়াশোনা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, এমন কি তা যেন বিলেতের অক্স্ফোর্ডের সমান সমান হয়। তিনি রামনের খোঁজ জানতেন, তাঁকে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক করে। ১৯১৭ সাল সেটি। রামন সেই সঙ্গেই তাঁর পুরনো ল্যাবরেটরি, ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রীট, ফিরে পেলেন।

কোলকাতায় ছিলেন ১৬ বছর, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ঐ সময়েই রামন-প্রভবের আবিষ্কার হয়।

রামন-প্রভব কি তা আজকের লেখায় বোঝান যাবে না, কারণ জায়গা নেই। সেজন্যে অন্য একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। তবু ছোট্ট করে বলি।

কোয়াণ্টম তত্ত্ব বলেছিল, আলো হচ্ছে শক্তিশালী ছোট ছোট কণার বাণ্ডিল,—তা ধনুকের তীর বা গুল্‌তির ঢেলার মত ছুটে চলে। বর্ণালী দেখার যন্ত্রের প্রিজমে যখন সাদা আলো সাত রঙে ভাগ হয়ে যায় তখন বোঝা যায় যে সাদা আলোর মধ্যে নানা আলাদা আলাদা শক্তির কণার প্যাকেট আছে। আলোর ঐ শক্তিধর কণার প্যাকেটগুলি যখন কোন বস্তুর গায়ে ধাক্কা খায়, তখন আসলে বস্তুর পরমাণুর সঙ্গেই তাদের সংঘর্ষ হয়। পরমাণুরাই ঐ ফোটন কণার সমান সমান হয়ে ওদের মহড়া নেয়। বস্তুর অণুতে পরমাণুরা বাঁধা থাকে নির্দিস্ট 'বলে' বা ফোর্সে—যাকে আণবিক বল বলা হয়। আলোককণা বা ফোটন যখন ধাক্কা খেল, তখন ছিট্‌কে পড়ায় তার শক্তি কিছুটা কমে যায়। শক্তির কম্‌তিটুকু বর্ণালী দেখার যন্ত্রে ধরা পড়ে। শক্তি কমে যায়, কারণ অণুগুলো ফোটনকণার ধাক্কায় কেঁপে উঠতে পারে,—ওদের কাঁপিয়ে দিয়ে ফোটন নিজের শক্তি কিছুটা খুইয়ে ফেলে। ১৯২৩।২৪ সালে রামনের ছাত্র রামনাথন ও কৃষ্ণান নানা স্বচ্ছ বস্তুতে ফোটন ধাক্কা খাওয়া বর্ণালী যন্ত্রে মাপছিলেন। তাঁদের পরীক্ষাফলে রামন কিন্তু দেখলেন, ফোটন অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেলে আবার কিছুটা শক্তি যেন বাড়িয়েও নিচ্ছে! এর মানে কি? বাড়তি শক্তি কোথা থেকে আসে? রামন বললেন,—ঐ বাড়তি শক্তি আসছে অণুতে পরমাণুগুলির নিজেদের বাঁধন শক্তি থেকে। পরমাণুরা অণুর মধ্যে বাঁধা থাকা অবস্থাতেই কাঁপছে, পাক খাচ্ছে—সেই বিচিত্র আণবিক বলের কিছুটা শক্তিই যেন ফোটনও পেয়ে যাচ্ছে। তার মানে, ধাক্কা খাওয়ার সময়ে অণুর ভেতরকার কিছু খবর যেন ফোটন বার করে নিয়ে আসছে। এই আবিষ্কারই হল রামন-প্রভব (Raman Effect)।

রামনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত পণ্ডিত মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সকলেই রামন বর্ণালী মেপে নানা জাতের অণুর মধ্যে পরমাণুদের বাঁধনশক্তি জানার কাজে লেগে পড়লেন। এই আবিষ্কার যেন পরমাণু রাজ্যে ঢোকবার সরল চাবিকাঠি!

স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন

এই আবিষ্কারের জন্যে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন পেলেন নোবেল প্রাইজ। ১৯২৪ সালে হলেন রয়্যাল সোসাইটির সভ্য। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে আসতে লাগল সম্মানের পসরা। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে 'স্যার' উপাধি দিল। হিউজেস্ মেডেল, ম্যাটেউচ্চি মেডেল, ফ্র্যাঙ্কলিন মেডেল প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্মানের নিদর্শন তাঁকে দেওয়া হল।

রামন ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কোলকাতায় ছিলেন। রামন প্রভব ছাড়াও তিনি শব্দ-বিজ্ঞান ও আলোক-বিজ্ঞান বিষয়ে আরও অনেক আবিষ্কার করেছেন। তিনি তৈরী করেছেন অসংখ্য ছাত্র, যাঁরা পরে নামকরা সব অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালেই বাঙ্গালোরে 'ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার' বা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যক্ষ হয়ে চলে গেলেন। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন রামন ইনস্টিটিউট। সেখানেও তৈরি করলেন অনেক ছাত্র, গবেষণা করলেন 'কৃস্ট্যাল' বিষয়ে। তিনি ছিলেন অসম্ভব কাজের লোক, কলরব সহ্য করতেন না, পছন্দ করতেন ফুল, গাছপালা, নৈঃশব্দ।

এই জ্ঞানতপস্বী ১৯৭০ সালের ২১শে নভেম্বর মারা যান।

বোস ইনস্টিটিউট
৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

অজানা মহাকাশে
১০
হোডার স্পাই।
শীগগীর লুকিয়ে পড়ো
কিন্তু ক্রেনের দেরি হয়ে গেল···
একটা লেসার-ফাঁস তার পা জড়িয়ে ধরলো।
পালাও সবাই পালাও
আমার চিন্তা কোরো না
এটা আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে দিকে নিয়ে যাবে···
যদি না ফাঁসটা পেঁচিয়ে রাখার শক্তিটাকে অকেজো করে দিতে পারি
পেঁচানো শুঁড়টাকে শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরে হোডার-স্পাইয়ের গায়ে সজোরে লাথি মারলো ক্রেন সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করতে একটা তড়িৎ চৌম্বকীয় শক্তির বর্ম তৈরী করে ফেললো সেই যন্ত্রযান
হোডার-স্পাইটা নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে বর্ম তৈরী করেছে। ফলে ফাঁসটা অকেজো হয়ে ছিঁড়ে গেছে।
ক্রেন ঝাঁপিয়ে পড়লো বহু নীচে, এক দুর্গন্ধময় জলাশয়ে।
বুনো লতা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

অজানা মহাকাশে
১১
এমন সময় এক অদ্ভুত প্রাণী দেখা দিল ঝোপের আড়াল থেকে।
ওটা আবার কি ধরনের জানোয়ার দেখে মনে হচ্ছে সাহায্য করতে চায়।
জন্তুটির দেওয়া শেকড় ধরে ক্রেন ধীরে ধীরে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এলো
তুমি যেই হও, ধন্যবাদ।
দেখে মনে হচ্ছে, এ শুধু আমার প্রান বাঁচায়নি, জঙ্গলে পথও দেখাবে।
একটা ঝোপে হোঁচট খেলো ম্যাট
ওঃ.... একটা শেকড়।
ওটা কি?
অদ্ভুত ফলটা থেকে একরকম গ্যাস বেরিয়ে এলো এবং ওরা দুজনেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লো।

[ক্রমশঃ]

সুদ-কষার সহজ নিয়ম

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ধার নিলে যে সুদ দিতে হয়, এটা হল কাণ্ডজ্ঞানের বিষয় কিন্তু সুদের পরিমাণ এবং হিসেব-নিকেশের সঙ্গে গণিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

সুদের প্রচলন এক অতি প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতির অন্তর্ভুক্ত, মুদ্রা আবিষ্কারের অনেক পূর্বেই যার ব্যবহার, হয় উৎপন্ন দ্রব্যের আংশিক পরিমাণকে সুদের মূল্য ধরে বা ধাতু খণ্ডকে লাগিয়ে।

আধুনিক যুগেও সুদের হিসেব নানাভাবে করা সম্ভব, কিন্তু অঙ্কের খাতায় তা দেখা যায় শুধু টাকা-পয়সায়। এই টাকা-পয়সায় সুদ দেওয়া এবং সুদ নেওয়া। যে ধার করছে, সে সুদ দিচ্ছে। সে অধমর্ণ। যে ধার দিয়েছে, সুদ সে পাচ্ছে, সে উত্তমর্ণ। সুদের হিসেবে এই অধমর্ণ এবং উত্তমর্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

ধরা যাক, আমি অধমর্ণ, ৫০ টাকা ধার করলাম। উত্তমর্ণ সুদ দাবি করলেন।

ধারের পরিমাণ ৫০ টাকা। কত দিন বাদে এই টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে? ৬ মাস। তাহলে টাকা যখন ফেরৎ দেওয়া হবে তখন চাই ৬০ টাকা। এখন না বললেও বোঝা যাচ্ছে যে সুদ আমি দিচ্ছি ১০ টাকা। কিন্তু সুদটা বেশি হল কি কম হল বা ঠিক কি রকম হল সেটা ভালভাবে বোঝা গেল না। আজ যিনি ৫০ টাকায় ৬ মাসের জন্যে ১০ টাকা সুদ দিচ্ছেন তাকে যদি কখনো ৮০০ টাকা ধার নেওয়ার জন্যে ৪ মাসে ৪০ টাকা সুদ দিতে হয়, তাহলে কি তিনি আলাদা হিসেবে সুদ দিচ্ছেন? না কি দু'বারেই তাঁকে একই হিসেবে সুদ দিতে হচ্ছে? হিসেবটা যখন ১০০ টাকার উপরে হয় এবং সময় সীমা যখন ১ বছর, তখন আর তাকে হিসেব বলি না। তাকে তখন বলা হয় হার; সুদের বেলায় সুদের হার। সুদের হার বলে আমরা যে সংখ্যাটা উল্লেখ করি তাহলো ১০০ টাকার ১ বছরের সুদ। এখন ৫০ টাকায় ৬ মাসের জন্যে যিনি সুদ দিচ্ছেন ১০ টাকা, ১০০ টাকার ১ বছরে তিনি দিচ্ছেন ৪০ টাকা অর্থাৎ সুদের হার ৪০।

৮০০ টাকার ৪ মাসে ৪০ টাকা সুদের বেলায় সুদের হার অর্থাৎ ১০০ টাকার ১ বছরের সুদ কত?

৮০০ টাকার ৪ মাসে ৪০ টাকা

১০০ টাকার ১ মাসে $\frac{৪০ \times ১০০}{৮০০ \times ৪}$ টাকা

১০০ টাকার ১২ মাসে $\frac{৫}{৪} \times ১২$ টাকা $=$ ১৫ টাকা

সুদের হার এ ক্ষেত্রে অনেক কম।

সুদের যে এই হার, এও নির্ণয় করা যায় সূত্র দিয়ে। কি ভাবে?

$$\text{সুদের হার} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

যে ৮০০ টাকায় ৪ মাসে ৪০ টাকা সুদ নিয়েছে, তার বেলাতেই দেখা যাক।

মোট সুদ ৪০ টাকা, আসল ৮০০ টাকা। সময়কে সব সময়ে বছরে এনে করতে হয় বলে ৪ মাস $= \frac{১}{৩}$ বৎসর। তাহলে, সুদের হার $= \frac{৪০ \times ১০০}{৮০০ \times \frac{১}{৩}}$

$= ১৫$ টাকা

সুদের হারের এই সূত্রকে আর একটু ভেঙ্গে গাণিতিক দিক দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়।

$$\text{সুদের হার} = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

$$\text{বা} = \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \frac{১}{১০০} \times \text{সময়}}$$

আসল $\times \frac{১}{১০০} \times$ সময়—এর অর্থ কি? নিশ্চয়ই ১ টাকা হারে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসলের সুদ।

[১০০ টাকার ১ বৎসর ১ টাকা; আসলের নির্দিষ্ট বৎসরে আসল $\times \frac{১}{১০০} \times$ সময়]

তাহলে সুদের হার

$$= \frac{\text{সুদ}}{\text{১ টাকা হারে নির্দিষ্ট সময়ে আসলের সুদ}}$$

এই কথাও বলা যায়।

সুদের হিসেবে সুদের হার হল প্রাণের মত। ধার করার সময়ে হারটুকু বললে কতটা সুদ তা ঠিক বোঝা যায় না বটে সুদের পরিমাণ ধারের তুলনায় যথেষ্ট না কম তা অনুমান করা যায় সঙ্গে সঙ্গে। আর সুদের হার থেকে সুদ গণনা করা যায় সহজ প্রক্রিয়ায়।

৪% হার সুদে ২৫০ টাকার ৬ বৎসরের সুদ কত?

৪% হার অর্থাৎ

১০০ টাকার ১ বৎসরের সুদ ৪ টাকা,

২৫০ টাকায় ৬ বৎসরের সুদ

$\frac{৪}{১০০} \times ২৫০ \times ৬ = ৬০$ টাকা

এই যে সুদের পরিমাণ সূত্র অনুসারে একে সাজাতে গেলে এ হলো

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল} \times \text{সময়} \times \text{হার}}{১০০} \text{ টাকা}$$

৭% হারে ৮০০ টাকার ৫ বছরের সুদ কত?

সূত্রের সাহায্যে

সুদের পরিমাণ

$$= \frac{৮০০ \times ৫ \times ৭}{১০০} \text{ টাকা} = ২৮০ \text{ টাকা}$$

সুদের হার, বৎসর এবং আসল দেওয়া থাকলে সুদের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় সঙ্গে সঙ্গে, হার যাই হোক, বৎসর যত ইচ্ছে থাক এবং আসল যেমন ইচ্ছে তেমনই ধরা যাক।

এখানে একটা কথা বললে ভাল হয়। সুদ কষার অধ্যায়ে নিয়ামকের সংখ্যা বেশি নয়। সুদের হার, আসল, সময় এবং সুদ। এর যে কোনো তিনটি দেওয়া থাকলে আমরা বাকিটি অর্থাৎ চতুর্থটি সহজেই বের করতে পারি।

আসল, সময় এবং সুদের সাহায্যে সুদের হার বের করেছি। সুদের হার, আসল, সময় নিয়ে চতুর্থ নিয়ামক সুদ জেনেছি।

যদি বলি, এবারে সময়, সুদ এবং সুদের হারের সাহায্য নিয়ে আসল বের করবো। তাহলে কি পারবো?

সুদ, ধরা যাক, ৩৮৪ টাকা ৪০ পয়সা, সুদের হার ৪%, সময় ৫ বছর ২ মাস।

যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে অঙ্কটি কষি, তাহলে লিখবো,

১০০ টাকার ১ বৎসরের সুদ ৪ টাকা

১০০ টাকার $\frac{৩১}{৬}$ বৎসরের সুদ $৪ \times \frac{৩১}{৬}$ টাকা

[৫ বৎসর ২ মাস = $\frac{৩১}{৬}$ বৎসর]

১ টাকার $\frac{৩১}{৬}$ বৎসরের সুদ $৪ \times \frac{৩১}{৬} \times \frac{১}{১০০}$ টাকা

আবার মোট সুদ ৩৮৪ টাকা ৪০ পয়সা অর্থাৎ তা হল $৩৮৪\frac{২}{৫}$ টাকা।

যদি ঠিকমতো সাজাই তাহলে পাই,

সুদ $৪ \times \frac{৩১}{৬} \times \frac{১}{১০০}$ টাকা যখন আসল ১ টাকা

সুদ $৩৮৪\frac{২}{৫}$ টাকা যখন আসল $\dfrac{৩৮৪\frac{২}{৫}}{৪ \times \frac{৩১}{৬} \times \frac{১}{১০০}}$ টাকা।

অর্থাৎ ১৮৬০ টাকা।

সূত্রাকারে যদি আসলকে সাজাই তাহলে আসলকে পাওয়ার সূত্রটি হবে,

$$\text{আসল} = \frac{\text{মোট সুদ (নির্দিষ্ট সময়ে)}}{\text{১ টাকার সুদ (নির্দিষ্ট সময়ে)}} \text{ টাকা}$$

অবশ্য আর এক ভাবেও আসলকে আমরা পেতে পারি।

$$\text{আসল} = \frac{\text{সবৃদ্ধি মূল}}{\text{১ টাকার সবৃদ্ধি মূল}} \text{ টাকা}$$

সবৃদ্ধি মূল কাকে বলে বুঝলেই আসলের এই সূত্রটিও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

সবৃদ্ধি মূল = সুদ + আসল।

তাহলে আসল হিসেব করবার সময়ে ১ টাকার সুদের বদলে ১ টাকার সবৃদ্ধি মূল নেবো এবং মোট সুদের বদলে সবৃদ্ধি মূল।

সূত্র দিয়ে করবার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

বার্ষিক ৭·৫% হার সুদে কত টাকার ৬ বৎসরের সুদ ৩৩৭·৫০ টাকা হইবে?

মোট সুদ এখানে জানি, তা হলো ৩৩৭·৫০ টাকা। ১ টাকার ৬ বৎসরের সুদ কত হবে?

১০০ টাকার ১ বৎসরের সুদ ৭·৫ টাকা

১ টাকার ৬ বৎসরের সুদ $\frac{৭·৫}{১০০} \times ৬$ টাকা

$= ·৪৫$ টাকা

তাহলে আসল $= \frac{৩৩৭·৫০}{·৪৫}$ টাকা $= ৭৫০$ টাকা

সবৃদ্ধি মূল অবলম্বনে আসল নির্ণয় করবার জন্যে আর একটি অঙ্ক করা যাক।

৪ টাকা হার সুদে কত টাকা ৬ বৎসরে সুদে মূলে ৮৯৭ টাকা ৭৬ পয়সা হবে?

এখানে ১ টাকার ৬ বৎসরের সুদ ২৪ পয়সা। সুতরাং ১ টাকার সবৃদ্ধি মূল ১২৪ পয়সা। এদিকে আসল সবৃদ্ধি মূলে হচ্ছে

৮৯৭·৭৬ পয়সা। তাহলে সূত্র অনুসারে আসল

$$= \frac{৮৯৭৭৬}{১২৪} = ৭২৪ \text{ টাকা}$$

আসল, সুদ, সুদের হার এবং সময় এই চারটি নিয়ামকের ভেতর

আসল, সুদ এবং সময় নিয়ে আমরা সুদের হার বের করেছি, সুদের হার, আসল এবং সময় দিয়েছে সুদ। সুদ, সুদের হার এবং সময় ধরে পাচ্ছি আসল। এবারে আসল, সুদ এবং সুদের হার নিয়ে সময় বের করবো।

বার্ষিক ৩⅓% হার সুদে কত বৎসরে ১৩৫০ টাকার সুদ হবে ২৭০ টাকা ?

সময়ের হিসেবে প্রথম প্রয়োজন মূলধনের ১ বৎসরের সুদ বের করা।

এখানে, ১০০ টাকার ১ বৎসরের সুদ $\frac{১০}{৩}$ টাকা

১ টাকার ১ বৎসরের সুদ $\frac{১০}{৩ \times ১০০}$ টাকা

১৩৫০ টাকার ১ বৎসরের সুদ $\frac{১০ \times ১৩৫০}{৩ \times ১০০}$ টাকা

অর্থাৎ ৪৫ টাকা।

আসল যেখানে ১৩৫০,

৪৫ টাকা সেখানে ১ বৎসরের সুদ

১ টাকা সেখানে $\frac{১}{৪৫}$ বৎসরের সুদ

২৭০ টাকা সেখানে $\frac{২৭০}{৪৫}$ বৎসরের সুদ

অর্থাৎ ৬ বৎসরের।

সূত্র হিসেবে সময়কে কিভাবে দেখাতে পারি ?

$$\text{সময়} = \frac{\text{সুদ}}{\text{আসলের উক্ত হারে ১ বৎসরের সুদ}}$$

$$\text{বা} = \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \frac{\text{হার}}{১০০}}$$

$$\text{বা} = \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \text{হার}} \times ১০০।$$

এখন, বের করতে হবে ৩⅛% হারে কত বৎসরে ২০০ টাকা ৫৫০ টাকা হবে ?

সূত্র অনুসারে,

$$\text{সময়} = \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \text{হার}} \times ১০০$$

এখানে সুদ = ২৫০ টাকা

আসল = ২০০ টাকা

হার = $\frac{২৫}{৮}$ টাকা

তাহলে,

$$\text{সময়} = \frac{২৫০}{২০০ \times \frac{২৫}{৮}} \times ১০০ = ৪০ \text{ টাকা}$$

একটি তালিকার ভেতরে সুদের হার, সুদ, আসল এবং সময়ের সূত্রটা দেখে নেওয়া যাক।

সুদের হার, সুদ, আসল এবং সময়ের ভেতরে দেওয়া আছে

১) সুদ, আসল, সময়, তাহলে সুদের হার

$$= \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}} = \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \frac{১}{১০০} \times \text{সময়}}$$

২) সুদের হার, আসল, সময়, তাহলে সুদ

$$= \frac{\text{আসল} \times \text{সময়} \times \text{হার}}{১০০}$$

৩) সুদের হার, সুদ, সময়, তাহলে আসল

$$= \frac{\text{মোট সুদ (নির্দিষ্ট সময়ে)}}{\text{১ টাকার সুদ (নির্দিষ্ট সময়ে)}}$$

$$= \frac{\text{সর্বৃদ্ধিমূল}}{\text{১ টাকার সর্বৃদ্ধিমূল}}$$

৪) সুদের হার, সুদ, আসল, তাহলে সময়

$$= \frac{\text{সুদ}}{\text{আসলের উক্ত হারে ১ বৎসরের সুদ}}$$

$$= \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \frac{\text{হার}}{১০০}}$$

$$= \frac{\text{সুদ}}{\text{আসল} \times \text{হার}} \times ১০০$$

সূত্র যেখানে সরাসরি কাজে লাগে সেখানে অসুবিধার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যখন একই অঙ্কের মধ্যে দুটো অংশ জুড়ে দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি সহজ অঙ্ক নিই।

বার্ষিক শতকরা কত হার সুদে ৭৫০ টাকার ২½ বৎসরের সুদ, বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হার সুদে ৫০০ টাকার ৫ বৎসরের সুদের সমান ?

অঙ্কটির দুটি অংশ। প্রথম অংশটি পরে আছে। শতকরা ৩ টাকা হার সুদে ৫০০ টাকার ৫ বৎসরের সুদ—এই সুদের পরিমাণ $\frac{৫০০}{১০০} \times ৫ \times ৩ = ৭৫$ টাকা।

তাহলে সম্পূর্ণ অঙ্কটি বদলে গিয়ে যে অঙ্কে পরিণত হচ্ছে তা হল, শতকরা কত হার সুদে ৭৫০ টাকার ২½ বৎসরের সুদ ৭৫ টাকা হবে ?

১) নম্বর সূত্র অনুসারে

$$\text{সুদের হার} = \frac{৭৫ \times ১০০}{৭৫০ \times \frac{৫}{২}} = ৪\%$$

অনুরূপ আর একটি অঙ্কে আসল বের করতে হবে।

বার্ষিক ৩% হার সুদে ২৫০ টাকার ৬ বৎসরের সুদ, কত টাকার ৫% হার সুদে ৪ বৎসরের সুদের সমান হবে ? [ক. বি.]

এই অঙ্কে দুটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশটি আগে দেওয়া হয়েছে।

৩% হারে ২৫০ টাকার ৬ বৎসরের সুদ (২) নম্বর সূত্র অনুসারে

$$= \frac{২৫০ \times ৬ \times ৩}{১০০} = ৪৫ \text{ টাকা}$$

তাহলে দ্বিতীয় অংশে ৫% হারে ৪ বৎসরে সুদ যখন ৪৫ টাকা, তখন আসল নির্ণয় করতে হবে?

সূত্র (৩)-এর দিকে তাকাই।

১০০ টাকার ১ বৎসরের সুদ ৫ টাকা

১ টাকার ৪ বৎসরের সুদ $৫ \times \frac{১}{১০০} \times ৪$ টাকা

$$\text{আসল} = \frac{\text{মোট সুদ}}{\text{১ টাকার সুদ}} = \frac{৪৫}{৫ \times \frac{১}{১০০} \times ৪} = ২২৫ \text{ টাকা}$$

একেবারে একই রকম আর একটা অঙ্ক এখানে উল্লেখ করছি।

বার্ষিক ৬% হার সুদে ৯০০০০ টাকার ৯ বৎসরের সবৃদ্ধিমূল, বার্ষিক ৪% হার সুদে কত টাকার ১৫ বৎসরের সবৃদ্ধিমূলের সমান হবে?

এখানে বার্ষিক ৬% হার সুদে ৯০০০০ টাকার ৯ বৎসরের সুদ = ৪৮৬০০ টাকা।

সবৃদ্ধিমূল = ১৩৮৬০০ টাকা

আসল বের করবার সময়ে (৩) নম্বর সূত্রের যদি দ্বিতীয় অংশটি নিই, তাহলে ১ টাকার ১৫ বৎসরের সবৃদ্ধিমূল বের করতে হবে।

১ টাকার ১৫ বৎসরের সবৃদ্ধিমূল

$$= ১ + \frac{৪}{১০০} \times ১৫ = \frac{১৬০}{১০০} \text{ টাকা}$$

$$\text{আসল} = \frac{১৩৮৬০০}{\frac{১৬০}{১০০}} = ৮৬৬২৫ \text{ টাকা}$$

আর এক ধরনের অঙ্ক আছে, অঙ্কের চেহারা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খুবই পরিচিত, তবু ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের অঙ্কে খুব ভয় পায়।

শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত হলে কোনো মূলধন ২৫ বৎসরে সুদে-মূলে ৩ গুণ হবে?

সুদের হার বের করবার সময়ে আসল ১০০ টাকা ধরে নেওয়া যাক। সুদে-মূলে তিন গুণ বলে সুদ ২০০ টাকা তাহলে তালিকার (১) নম্বর সূত্র অনুযায়ী,

$$\text{সুদের হার} = \frac{২০০ \times ১০০}{১০০ \times ২৫} = ৮\%.$$

যারা বীজগণিত এবং X-এর সাহায্য নিয়ে অঙ্কের সমাধান বের করতে চায়, তারা তাও করতে পারে।

এক্ষেত্রে মূল = X এবং সুদ = ২X।

এই রকম আর একটি অঙ্ক কষবার জন্যে দেওয়া যাক।

বার্ষিক ৫% হার সুদে কত বৎসরে কোনো মূলধন সুদে-আসলে দ্বিগুণ হবে?

প্রশ্নের উত্তর ২০ বৎসর।

সুদ কষায় কিছু কিছু অঙ্ক আছে যা X-এর সাহায্যে করা ভাল।

A, B-কে কিছু টাকা এবং C-কে B অপেক্ষা আরও ৮০০ টাকা বেশি ধার দিল। B বার্ষিক ৫% হারে এবং C বার্ষিক ৭% হারে সুদ দিতে রাজি হল। উভয়েই ৫ বৎসরের শেষে সুদে-মূলে ধার শোধ করল। যদি C, B অপেক্ষা ১২৪০ টাকা বেশি দিয়ে থাকে, তবে B এবং C প্রত্যেকে কত টাকা ধার করেছিল?

[স্কুল ফাইনাল '৫৬]

এখানে B-এর ধার করা টাকার পরিমাণ যদি X-এর সমান হয়, তাহলে C ধার করেছিল (X + ৮০০) টাকা। B টাকা শোধ দিয়েছে ৫% হারে ৫ বছরে। ৫ বছরের শেষে সুদে-আসলে তাহলে B-কে দিতে হয়েছে—

$$\text{আসল} + \text{সুদ} = X + \frac{X \times ৫ \times ৫}{১০০} = X + \frac{X}{৪} \text{ টাকা।}$$

একই ভাবে C দিয়েছে আসল + সুদ

$$= (X + ৮০০) + \frac{(X + ৮০০) \times ৭ \times ৫}{১০০}$$

$$= \frac{২৭X + ২১৬০০}{২০} \text{ টাকা।}$$

B এবং C-এই দুজনের শোধ করা টাকার পরিমাণ সমান নয়। C দিয়েছে B থেকে ১২৪০ টাকা বেশি।

তাহলে B + ১২৪০ = C

সমাধান করলে X = ১৬০০ টাকা।

∴ B ধার করেছিল ১৬০০ টাকা

C ধার করেছিল ২৪০০ টাকা।

যদি কেউ বলে X-এর সাহায্য না নিয়েই এই অঙ্কটি করবে, তাহলে কি ভাবে এগোবে সে?

B-এর থেকে C-এর ধার করা টাকার পরিমাণ ৮০০ টাকা বেশি। এই অতিরিক্ত টাকার জন্যে অতিরিক্ত সুদ-আসলের পরিমাণ ৮০০ + $\frac{৮০০}{১০০}$ × ৭ × ৫ = ১০৮০ টাকা।

কিন্তু C-এর সুদ-আসল B-এর সুদ-আসলের চেয়ে (১২৪০ − ১০৮০ =) ১৬০ টাকা বেশি।

কিসের জন্যে এ রকম হল?

১০৮০ টাকা বেশি অতিরিক্ত ৮০০ টাকার জন্যে। আর এই ১৬০ টাকা বেশি মূলটুকুর সুদের জন্যে, বা B-এর টাকার জন্যে। কারণ B এবং C-এর দুজনের সুদের হার সমান নয়। C বেশি হারে সুদ দিচ্ছে। B আর C-এর ধার শোধ করার ব্যাপারে বছরের পরিমাণ সমান। শুধু ১০০ টাকা আসল হলে C-এর সুদ লাগছে বছরে ২ টাকা করে বেশি। তাহলে ৫ বছরে ১০ টাকা, যদি আসল বা মূল হয় ১০০ টাকা।

অতিরিক্ত ১০ টাকা সুদ, আসল ১০০ টাকা

অতিরিক্ত ১৬০ টাকা সুদ, আসল ১৬০০ টাকা।

∴ B ধার করেছিল ১৬০০ টাকা। C ধার করেছিল ১৬০০ + ৮০০ টাকা = ২৪০০ টাকা।

এই ধরনের অঙ্ক বোধ হয় X দিয়ে কষাই সুবিধা-জনক। X অবলম্বনে অনেক সহজে কষা যায় এমন আর একটি অঙ্ক দিচ্ছি।

এক ব্যক্তি ১৮৭৫০ টাকা তাঁর ১২ বৎসর ও ১৪ বৎসর বয়স্ক দুই পুত্রকে এরূপভাবে ভাগ করে দিলেন যে, ওদের প্রত্যেকের বয়স যখন ১৮ বৎসর হবে তখন বার্ষিক ৫% হারে ওদের প্রত্যেকের টাকা সুদে-আসলে সমান হবে? বর্তমানে প্রত্যেকে কত টাকা করে পেলো?

অনুশীলনী

সুদ-কষার মধ্যে যে জটিলতার কিছু নেই অনুশীলনীতে দেওয়া অঙ্কগুলি কষবার চেষ্টা করলেই তা বুঝতে পারবে। এই অঙ্কগুলি আদর্শ স্থানীয়। হয় মাধ্যমিকে, না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসেছে বা আসতে পারে এমন অঙ্ক।

১। এক ব্যক্তি বার্ষিক ৫% হারে ১২০০০ টাকা ধার করলো। তৃতীয় বৎসরের শেষে কত টাকা দিলে সে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করতে পারবে?

উত্তর : ১৩৮০০ টাকা

[স্কুল ফাইনাল '৬১]

২। বার্ষিক সুদের হার ৪% থেকে কমিয়ে $৩\frac{৩}{৪}$% হওয়ায় কোনো ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৬০ টাকা হ্রাস পেলো। ওই ব্যক্তির মূলধন কত?

উত্তর : ২৪০০০ টাকা

[কলি. বিশ্ব.]

৩। কোনো মূলধনের বার্ষিক ৫% হারে ১ বৎসর ৯ মাসে যে সুদ হয়, বার্ষিক $৪\frac{১}{২}$% হার সুদে ২ বৎসর ৪ মাসে তদপেক্ষা ৬৩ টাকা বেশি সুদ হয়। মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর : ৩৬০০ টাকা

[মাধ্যমিক '৭৮]

৪। কোন মূলধন ১৬ বৎসরে সুদে-মূলে দ্বিগুণ হয়। কত বৎসরে একই হারে ৩ গুণ হবে?

উত্তর : ৩২ বৎসর

[মাধ্যমিক কম্পার্ট '৭৮]

৫। এক ব্যবসায়ী কোনো ব্যাঙ্ক থেকে বার্ষিক ১২% হার সরল সুদে ৫০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করলো। ৩ বৎসর পরে তিনি ব্যাঙ্ককে মোট ২৫০০০ টাকা পরিশোধ করলেন। আরও ৫ বৎসর পরে তিনি তাঁর ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে, তখন তাঁকে কত টাকা ব্যাঙ্ককে দিতে হবে?

উত্তর : ৬৮, ৮০০ টাকা

[মাধ্যমিক '৭৭]

সুদ-কষা গণিতের একটি সহজ অধ্যায়। সুদ, সুদের হার, আসল এবং সময় বের করবার প্রাথমিক নিয়মগুলি মনে রাখলে অঙ্ক যেমনই হোক না কেন, ধাপে ধাপে নিশ্চয়ই তার সমাধান বের করা সম্ভব।

পড়া পড়া খেলা

অলক চক্রবর্তী

এসো একটু পড়া পড়া খেলা যাক। আমরা মোটামুটি সবাই অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে অল্প বিস্তর খবর রাখি, তবুও অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা সংক্ষেপে করে নিয়ে কয়েকটা প্রশ্নের অবতারণা করব। দেখ তো, সেগুলোর উত্তর দিতে পারো কিনা? এটা একদমই খেলা, নেহাৎ পড়ার গন্ধ আছে বলে বলছি পড়া পড়া খেলা।

আচ্ছা তাহলে খেলাটা আরম্ভ করা যাক, বলতে শুরু করি।

1. তাপের প্রয়োগে বা অপসারণে কোন্ পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বদলে যাওয়াকে অবস্থা পরিবর্তন বলে।

2. একটি নির্দিষ্ট চাপে এবং নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন্ পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থা প্রাপ্তির নাম গলন।

3. স্বাভাবিক চাপে যে উষ্ণতায় কোন্ কঠিন পদার্থের গলন হয় তাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বলে।

4. একটি নির্দিষ্ট চাপে এবং নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন্ তরল পদার্থের কঠিন অবস্থা প্রাপ্তির নাম কঠিনীভবন।

5. স্বাভাবিক চাপে যে উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ জমে কঠিন হয় তাকে ঐ পদার্থের হিমাঙ্ক বলে।

6. কেলাসিত পদার্থ মাত্রেরই হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্ক এক হয়ে থাকে। অকেলাসিত পদার্থের এরকম হয় না।

7. তরল পদার্থ কঠিনে পরিণত হলে আয়তন কমে যায়। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। বরফ, পিতল, ঢালাই লোহা ইত্যাদিতে উল্টো ঘটনা ঘটে।

8. তরল পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

9. যে কোন উষ্ণতায় কেবল তরলের উপরের তল থেকে ধীরে ধীরে তরলের বাষ্পের পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে বাষ্পায়ন বলে।

10. বাষ্পায়ন দ্রুত বা ধীরে হবে কিনা, সেটা নীচে লেখা কারণগুলির উপর নির্ভর করে—

(ক) তরল পদার্থের প্রকৃতির ওপর, জল হলে একরকম, সেন্ট হলে আরেক রকম হবে বাষ্পায়নের হার।

(খ) তরল পদার্থের এবং এর সংলগ্ন বায়ুর উষ্ণতা বাড়ালে বাষ্পায়ন তাড়াতাড়ি হবে।

(গ) তরল পদার্থের মুক্ততলের ক্ষেত্রফল বেশী হলে বাষ্পায়ন তাড়াতাড়ি হবে।

(ঘ) তরল পদার্থের উপরকার বায়ুর চাপ বাড়ালে বাষ্পায়ন ধীরে ধীরে হয়।

(ঙ) বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকলে বাষ্পায়নের হার দ্রুত হয়।

(চ) তরল পদার্থের মুক্ততল যে বায়ুর সংস্পর্শে আছে সেই বায়ুর চলাচল হলে বাষ্পায়ন তাড়াতাড়ি হয়।

11. পরিপার্শ্বের চাপের ওপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের খুব দ্রুত বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্ফুটন বলে।

12. স্বাভাবিক চাপে যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফুটন সংঘটিত হয় তাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে।

13. স্ফুটনাঙ্কের হার নীচে লেখা কারণগুলির উপর নির্ভর করে—

(ক) তরল পদার্থের প্রকৃতির উপর।

(খ) তরল পদার্থের উপরকার চাপ বাড়ালে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে।

(গ) তরল পদার্থ বিশুদ্ধ না হলে স্ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্কের সমান হয় না।

উপরের লেখাটা ভালো করে পড়ে এবার নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1. 200CC জল জমলে এর আয়তন হবে,
   198CC, 218CC, 200CC.

2. একটা লোহার রড মোমশিখার উপর ধরলে রডটি

   গলে যাবে/বেড়ে যাবে/তেতে উঠবে/উবে যাবে ।

3. চাপ বদলালে গলনাঙ্ক
বাড়ে / কমে / একই থাকে।

4. জলের মুক্তপৃষ্ঠের উপর বায়ুর চাপ কমালে, স্ফুটনাঙ্ক
বাড়ে / একই থাকে / কমে।

5. জলকে 80° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় ফোটানো
সম্ভব / অসম্ভব।

6. জলকে 105° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরল রাখা
সম্ভব / অসম্ভব।

7. ন্যাপথালীনে তাপ দিতে থাকলে সময়ের সঙ্গে উষ্ণতা নীচের ছবির মত বদলায়।

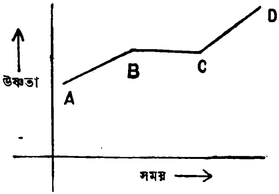

চিত্রের AB, BC, এবং CD অংশ কি বোঝাচ্ছে?

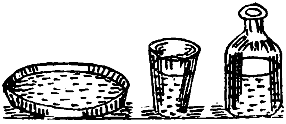

9. বাষ্পীভবন কম করার জন্য কোন্ পাত্রটি ব্যবহার করা হয়?

10. এক গেলাস জলকে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের উপর রেখে বায়ু বার করে নিলে জলের কি হবে?

11. ফুটন্ত জল থেকে খানিকটা জল ঢেলে নিলে জল তথা তাপও নিষ্কাশিত হল। একে কি অবস্থার পরিবর্তন বলা হয়?

12. নীচের অনুচ্ছেদে ভুল আছে, সংশোধন কর।

চাপ বদলিয়ে কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থা প্রাপ্তির নাম গলন। যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থের গলন হয় স্ফুটনাঙ্ক বলে। সেণ্টের উবে যাওয়ার কারণ হচ্ছে স্ফুটন। ঘামলে হাওয়া খাই কারণ তাতে বায়ুর চাপ কমে যায়।

প্রশ্নগুলির উত্তর যদি দিতে পারো তাহলে তোমার জ্ঞানের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ধরতে হবে। অর্থাৎ বুঝতে হবে কঠিন, তরল, বায়বীয় এবং তোমার জ্ঞানের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

8. নীচের কোন্ চিত্রটি বরফের জন্য?

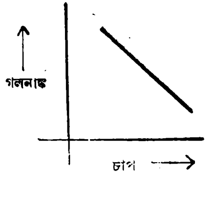

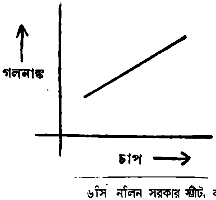

৬সি নলিন সরকার স্ট্রীট, কলি-৪

ডাইনোসোরের মৃত্যু

অলোককুমার সেন

স্কুল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ যদি মাঝরাস্তায় মুখোমুখি দেখা হয় ব্রাকিওসোরাসের সঙ্গে, তাহ'লে কি ভয়ে আতঁকে উঠবে ? নাকি বিস্ময়ে হবে হতবাক ? সত্যি পঞ্চাশ টন ওজনের এই নিরীহ নিরামিষ ভোজী ডাইনো-সরের সামনে দাঁড়ালে মনে হতে পারে মানুষ কত অসহায় !

টাইরানোসরস

কিংবা ধরো, খেলার মাঠের কোণে যদি বসে থাকে তিরিশ ফুট লম্বা দাঁতাল টাইরানোসেরাস, যারা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খায় জীবজন্তু, তাহলে বোধ হয় সেদিনের খেলা আর হবে না। ভাগ্যিস, আজকের পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে এই সব অতিকায় দৈত্য পশুর দল, না হলে মানুষ কি পা রাখতে পারতো এই পৃথিবীতে ?

বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করেছেন, কেমন ভাবে হারিয়ে গেলো সেদিনের সেই অতিকায় ডাইনোসোরেরা, কোথায় গেল আপার জুর‍্যাসিক যুগের নব্বই ফুট লম্বা ডিপ্‌লো-ডোকাস ?

সারা গায়ে তীক্ষ্ণ কাঁটার বিদঘুটে পোশাক পরা স্টেগোসোরাস, অ্যাঙ্কাইলোসেরাস অথবা ট্রাইসেরাটোপ আর কোনদিন ভয় দেখাবে না আমাদের। তাদের মৃত জীবাশ্ম যাদুঘরের অন্ধকারে স্থান পেয়েছে।

কেমন ভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবী থেকে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তার অবকাশ নেই, এমন কি তুমুল তর্কের ঝড় উঠেছে বারবার। অনেকে বলে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে নীল আকাশের বুক চিরে সেদিনের পৃথিবীতে নেমে এসেছিল এক অভিশপ্ত তারা। তখন মানুষের জন্ম হয় নি, ডাইনোসোরেরা তখন ছিল পৃথিবীর সম্রাট। তাদের অজান্তে মাথার ওপর একদিন উদিত হলো সেই তারাটি। তারপর ধীরে ধীরে তার আকার ও উজ্জ্বলতা ক্রমেই বাড়তে থাকলো, অবশেষে মনে হলো সে যেন আর এক সূর্য।

একদিন বসুন্ধরার সারা দেহে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে সেই আগ্নেয় তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে। উত্থিত তরঙ্গ যন্ত্রণায় আকাশ স্পর্শ করলো। তারপর ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল পৃথিবীর বাতাস।

একশো বছর ধরে চললো এই ধ্বংসের খেলা, তারপর ঘটে গেল নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তন। আর সেদিনের বাসিন্দারা অনেকেই চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। তাপমাত্রা কমায় অতিকায় জন্তুরা মরে গেলো, সাগরের জল গেল বিষিয়ে, নানা প্রজাতির প্লাঙ্কটন দলে দলে ধ্বংস হলো এখানে সেখানে।

পঞ্চাশ বছর বাদে দেখা দিল বরফ যুগ বা 'আইস এজ'। ইতিমধ্যে ছোট আকারের জন্তুরা এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে খুঁজে নিয়েছে জীবনের ঠিকানা, তারপর বিবর্তনের ধারায় তাদের মধ্যে থেকে এসে দাঁড়ালো সেদিনের নবজাতক মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান এমন ভাবেই ব্যাখ্যা করে ডাইনোসোরের মৃত্যু আর স্তন্যপায়ীর জন্মরহস্যের। যদিও এই ধারণার অনেকখানি কালের গর্ভে বিলীন তবুও এর অন্তরালে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক

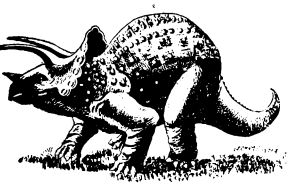

ট্রাইসেরাটপস্

যুক্তি আছে। সুইজারল্যাণ্ডের সুইস ফেডারেল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কেনেথ হোসু এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে ঐ অভিশপ্ত তারা আর কিছুই নয়, সে হলো এক ধূমকেতু, যার সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয়েছিল। সম্প্রতি ডাইনোসোরদের ওপর যে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে তা থেকে এই মতবাদের সমর্থনে অনেক কথাই জানা যায়। যেমন ধরো স্পেন আর ইটালির ভূগর্ভে অন্বেষণ চালিয়ে পাওয়া গেছে ইরিডিয়াম, অসমিয়াম আর আর্সেনিকের মত ধাতুর চিহ্ন। এরা সব হলো সেই ক্রেটাসিওয়াস-টারসিয়ারি যুগের, যে কালসীমায় ডাইনোসোররা বিদায় নিয়েছিল পৃথিবী থেকে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে এদের ব্যাপক উপস্থিতি আমাদের অবাক করে দেয়। কেননা পৃথিবীর মাটিতে এই তিনটি ধাতুর অবস্থিতি খুবই কম। অথচ প্রতিবেশী গ্রহে, চাঁদে, গ্রহাণুপুঞ্জে ও সূর্যে এরা বেশী পরিমাণে আছে। তাই হয়তো এমন চিন্তা করা ভুল হবে না যে, আদিকালের কোন এক অপার্থিব ঘটনায় এরা পা রেখেছিল মাটির পৃথিবীতে।

এতদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম যে প্রতিকূল আবহাওয়া, অগ্ন্যুৎপাতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড-অক্সিজেন অনুপাতের পরিবর্তনেই ডাইনোসোরেরা হারিয়ে গেছে। এই অনুসন্ধান করার পর পুরোনো মতবাদগুলো আর টিঁকছে না।

অবশ্য কেউ কেউ ধূমকেতুর আগমন ছাড়াও অন্যান্য অপার্থিব বিস্ফোরণের কথা ভাবছেন। কি সেই বিস্ফোরণ? হয়তো বা কোন "দানব তারা'র (সুপার নোভা) আক্রোশ, এক শক্তিশালী সৌর অগ্ন্যুৎপাত অথবা রাশি রাশি উল্কার ধারাবাহিক আক্রমণ। প্রসঙ্গতঃ আমরা ১৯০৮ সালে রাশিয়ার বুকে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণের কথা মনে করতে পারি। এর ফলে সাইবেরিয়ার তুংগুসকা নামের বিরাট অরণ্য অঞ্চল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর থেকে সৃষ্টি হয় ৫০-২০০ মিটার লম্বা অসংখ্য গহ্বর। এই মহাপ্রলয়ে যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রায় হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে জীবন-হানি দেখা দেয়। এই ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক সর্বনাশা ধূমকেতু, যার ওজন ছিল ৫×১০^{১০} গ্রাম।

সুইস বিজ্ঞানীর মতে প্রাচীন যুগের সেই ধূমকেতুটি এর থেকেও বড় ছিল। হয়তো তার ওজন ছিল $১০^{১৮}$ গ্রাম, পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের সময় $১০^{৩১}$ আর্গ শক্তি নিঃসৃত হয়। সৃষ্টি হয় ১৫০ কিলোমিটার ব্যাস-যুক্ত বিশাল গহ্বর। কিন্তু তেমন বড় কোন গহ্বরের সন্ধান পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায় নি বলে অনুমান করা যেতে পারে যে শয়তান ধূমকেতু তার শয়তানি শেষ করে মহাসমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। কে জানে, আজও হয়তো বেঁচে আছে সাড়ে ছ' কোটি বছর আগের সেই অতিকায় গহ্বর, মহাকাল যার বুকে দিয়েছে শুধুই রাশি রাশি বালি আর পাথরের আচ্ছাদন।

ধূমকেতুর বর্ণালী বিশ্লেষণে আমরা জেনেছি যে এর মধ্যে বিষাক্ত হাইড্রোজেন আর মিথাইল সাইনামাইড আছে। তাই পৃথিবীর বাতাসে প্রবেশের সাথে সাথে ঘর্ষণজনিত তাপে বিপর্যয় দেখা দেয়। বায়বীয় পদার্থ আশ্রয় নেয় পার্থিব বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে। এমন কি সমুদ্র গর্ভে ঘুমিয়ে পড়ার পরেও সেই ধূমকেতু অত্যধিক তাপ আর নানা

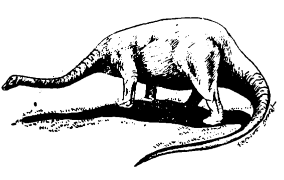

ডিপ্লডকাস

যৌগিক পদার্থে পরিপূর্ণ বাষ্প নিঃসরণ করতে থাকে। এর ফলে সাগরের তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, তাপ প্রবাহ ছুটে আসে স্থলভাগের ওপর, বড় আকারের জন্তুরা তাতেই

প্রাণ হারায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণীরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই সর্বনাশা বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। যাদের ডিম ঢাকা ছিল মাটির আড়ালে তাদের বংশ লুপ্ত হতে হতে বেঁচে যায়। প্লাঙ্কটনের মৃত্যুতে সমুদ্রের সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্য শৃঙ্খল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার সামুদ্রিক প্রাণী অসহায় আর্তনাদে অনাহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু যেসব প্রাণী নীল সমুদ্রের অনন্ত অতলান্তে বাস করে, সেখানে তরঙ্গের আনাগোনা খুবই কম, তারা বিষাক্ত পরিবেশের শিকার হয় নি। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে উত্থিত গ্যাসীয় যৌগিক পদার্থ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে বরফ যুগের পটভূমি রচনা করে।

কোটি কোটি বছর আগে এই বিশ্বের রঙ্গশালায় হেঁয়ালি প্রকৃতির যে রুদ্ধশ্বাস নাটক অভিনীত হয়েছিল, কল্পনা আর বাস্তবের লেখনীতে এই হল তার জীবন্ত সংলাপ।

আবিষ্কারের গল্প

স্টেথোস্কোপের আবিষ্কার

প্রদীপকুমার দাস

অসুখ করলে আমরা ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার বাবু এসে নানান প্রশ্ন করেন। জিব দেখেন। চোখ দেখেন। নাড়ী টেপেন। স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করেন। তখনই মনে হয় ডাক্তারবাবু স্টেথোসকোপ দিয়ে কি শোনেন? নিজেরও ইচ্ছে করে স্টেথোসকোপ লাগিয়ে শুনতে। এই ইচ্ছেও জেগেছিল এক বালকের মনে। নাম রেনে লেনাক। স্টেথোসকোপের আবিষ্কার তখন হয় নি। সেই সময় ডাক্তারী শাস্ত্রে বুকের শব্দ শুনতে হ'ত নিজের কান বুকে লাগিয়ে। লেনাক তখন স্কুলে পড়ত। কাকা ছিলেন নামকরা ডাক্তার। পড়াশুনা শেষে অবসর সময় কাটাতো কাকার চেম্বারে। দেখত মাঝে মাঝে কাকা রুগীর বুকে কান লাগিয়ে কি যেন শুনছেন? কাকাকে জিজ্ঞেসা করলে বলতেন, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনে তিনি রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন। আস্তে আস্তে বড় হল লেনাক। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে ডাক্তারীতে ভর্তি হল। সময়ের ব্যবধানে একসময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ডাক্তার হলেন। তিন বছর সৈন্যবিভাগে শল্যচিকিৎসকের কাজ করে প্যারিসে ফিরে এলেন। ১৮১৬ সালে যোগ দিলেন নেকার হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসক হিসেবে। প্রাতঃকালীন ভ্রমণ ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। এমনি এক সকালে প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দেখলেন পার্কে কয়েকটি বাচ্চা ছেলেকে। কাগজের চোঙে মুখ লাগিয়ে একজন বলছে, অপর জন শুনছে। মনে মনে ভাবলেন ঐ রকম চোঙের সাহায্যে নিশ্চয়ই বুকের শব্দ কানে শোনা যেতে পারে? নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন ভদ্রমহিলা এলেন তাঁর চেম্বারে। ভদ্রমহিলাটি খুবই অসুস্থ। বহুদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত। ডাক্তারের কাছে এসেছেন সুচিকিৎসার জন্য; ভদ্রমহিলাটির কষ্টের কথা মন দিয়ে শুনলেন। খুব চিন্তায় পড়লেন। কিভাবে তাঁকে পরীক্ষা করবেন? সেই সময়ে বয়স্ক মেয়েদের গায়ে হাত লাগিয়ে কোন পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ভদ্রমহিলাটির বুকে কান লাগিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনাও অসম্ভব ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর সকালের ঘটনা। ছেলেদের কাগজের চোঙ নিয়ে খেলার কথা। মনস্থির করে ফেললেন। ভদ্রমহিলাটিকে অপেক্ষা করতে বললেন। চটপট একটা কাগজের চোঙ বানিয়ে ফেললেন। তিন পাক দিয়ে আঁঠা দিয়ে জুড়ে দিলেন। তারপর চোঙটি রুগীর বুকে লাগিয়ে অপর প্রান্তে কান পাতলেন। কি আশ্চর্য! ধুক ধুক শব্দ ভাল শোনা যাচ্ছে! যেমনটি বুকে কান পাতলে শোনা যায়! বুকের শব্দ শোনা যায় বলে নামকরণ হল থোরাকোস্কোপ। লেনেকের নামটি মনঃপূত হল না। তিনি নাম দিলেন স্টেথোসকোপ। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কাগজের বদলে একটা কাঠের স্টেথোসকোপ তৈরী করলেন। স্টেথোস্কোপে একটা কাঠের চোঙ লাগানো। চোঙটি লম্বায় তের ইঞ্চি। পরিধিতে দেড়

ইঞ্চি। চোঙটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে লম্বালম্বি একটা ছিদ্র। ছিদ্রটির পরিধি ৩১৪ ইঞ্চি। ছিদ্রটির বুকের প্রান্তে ফানেলের আকারে তৈরী। উদ্দেশ্য সমস্ত শব্দকে একত্রিত করে কানে পাঠানো। এরপরে পিয়ারী লেনেকের তৈরী স্টেথোসকোপে আরও কিছু পরিবর্তন ঘটান। চোঙের পরিধি কমিয়ে সরু চোঙ ব্যবহার করেন। বুকের প্রান্তটিকে (চেস্ট পিস) ফানেলের আকারে না রেখে ঘণ্টার আকারে তৈরী করেন। লেনেকের প্রিয় ছাত্র সি. জে. বি. উইলিয়াম্‌স মেহগেনী কাঠের একটি স্টেথোস্‌কোপ তৈরী করেন। তাঁর স্টেথোসকোপে বুকের ও কানের দুটি তৈরী করেন। বুকের অংশটি মেহগেনী কাঠের তৈরী। চেস্ট-পিসের একপ্রান্তে দুটি বাঁকানো সিসের নল যুক্ত। নল দুটি ঠিক ঠিক কানে এঁটে যেত। ১৮৬০ সালে নিউ ইয়র্কের জর্জ ফিলিপ্ ক্যামান খুবই উন্নত মানের দুই নল যুক্ত স্টেথোস্‌কোপ তৈরী করেন। আজকাল ডাক্তাররা যে স্টেথোস্‌কোপ ব্যবহার করেন সেটি ক্যামানের স্টেথোসকোপেরই অনুরূপ। সম্প্রতি হৃদরোগের প্রকোপ খুব বেশি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি হৃদরোগের কারণ নির্ণয় করা ডাক্তারের পক্ষে আজকাল খুব কঠিন কাজ নয়। এটি সম্ভব হয়েছে স্টেথোস্‌কোপ আবিষ্কারের জন্য।

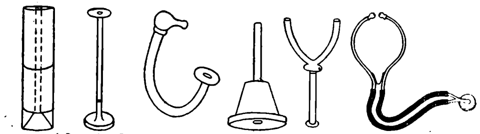

ডাঃ লেনাকের তৈরী পিয়ারীর তৈরী ডাঃ উইলিয়ামসের তৈরী ডাঃ লেয়ার্ডের তৈরী আধুনিক স্টেথোসকোপ

প্রান্তই পটহাকার (ট্রামপেট)। বুকের অংশটি কানের অংশ থেকে আকারে বড়। লেনেক বা পিয়ারীর স্টেথোস্‌কোপে বুকের উপর দিকের অংশের শব্দ ভাল শোনা যেত না। উইলিয়ামসের স্টেথোসকোপে সে অসুবিধে দূর হয়। এর কিছুদিন পরে চোঙের জায়গায় রবারের নল ব্যবহার করা হয়। একনল স্টেথোসকোপে বুকের শব্দ বেশিক্ষণ শোনা যেত না। মাথা ধরে যেত। তাই ১৮৫১ সালে ডাক্তার লেয়ার্ড দুই নল যুক্ত স্টেথোস্‌কোপ

শুধু হৃদরোগ নয়, প্লুরিসি, ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য বুকের অসুখও উন্নতমানের স্টেথোসকোপে কান লাগিয়ে ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি রোগগুলি নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রতিটি ডাক্তার যখনই কানে লাগান স্টেথোসকোপ, তখনই স্মরণ করেন স্টেথোসকোপের জনক ডাক্তার রেনে লেনাকের নাম। চিকিৎসা জগতে তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর অমূল্য আবিষ্কারের জন্যে।

ইণ্টারনী, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ
কলিকাতা-১৭।

খেলোয়াড় ও খাদ্য তালিকা

অরূপ রায়

বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আমাদের এক-পা এগোনোর সাধ্য নেই একথা কে না জানে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অবদান অপরিহার্য। এমন কি খেলাধূলার মান উৎকর্ষ কল্পেও আমরা আজ বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছি। খেলার আসরে পারদর্শী হতে হলে সর্বাগ্রে শরীরকে রাখতে হবে সুস্থ ও শক্তিসমৃদ্ধ। আর শরীরকে সুস্থ ও শক্তিসমৃদ্ধ রাখতে দেহের দরকার সুষম খাদ্যের (Balanced or Ideal Diet)। বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একজন খেলোয়াড়ের দৈনন্দিন কি কি খাদ্যের প্রয়োজন—কতটা পরিমাণে প্রয়োজন ইত্যাদি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং খেলাধূলার জগতে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বলতে আমরা সর্বাগ্রে বুঝি খেলোয়াড়ের খাদ্য নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রয়োগ। এই প্রবন্ধে ভারতীয় খাদ্য তালিকা অনুসরণ করা হবে।

যে কোন প্রাণীকেই জীবনধারণের জন্যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হয়। খাদ্য দেহকে শক্তি প্রদান করে। আবার যেহেতু সব খাদ্য এক ধরনের নয়, সুতরাং বিভিন্ন খাদ্যের উপাদানও বিভিন্ন। এই খাদ্যস্থিত বিভিন্ন ধরনের উপাদান সমূহ দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে নিজ নিজ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি কোন্ খাদ্যে কোন্ কোন্ উপাদান কত পরিমাণ বর্তমান, কোন্ উপাদান দেহের কোন্ উপকারে লাগে অথবা কোন খাদ্য কোন্ বয়সে গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত এবং খাদ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী পরিমাণ হবে কতটা। এই প্রবন্ধে আমি প্রধানতঃ একজন খেলোয়াড় কিশোর বা কিশোরীর জীবনে বিজ্ঞানসম্মত সুষম খাদ্য কি হওয়া উচিত এবং খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সমূহের দেহ গঠনে ও দেহকে শক্তি যোগানোর পথে কার কি ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

খাদ্য কি ? খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ করে, বিপাকীয় শক্তি (Metabolic Energy) ও কার্য করার শক্তি যোগায়, যোগায় সাথে সাথে দেহ গঠনে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকারক দ্রব্য (Nutrients) ও তাপ।

দেহে পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার নির্ভর করে দেহ গঠনের (ওজন ও দৈর্ঘ্য দুই-ই) গতির ওপর। সাধারণতঃ শিশুকালে (Infancy) দেহ গঠনের হার থাকে সর্বোচ্চ এবং ক্রমশঃ এই গতি হ্রাস পায়। পুনরায় কৈশোরে পদার্পণের (Adolescence) সাথে সাথে দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি পায়। অতএব, শৈশবে এবং কৈশোরেই দেহের পরিবর্তন ঘটে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এবং এই বয়সের ছেলেমেয়েরাই সাধারণতঃ লেখাপড়া ও খেলাধূলায় পারদর্শিতা অর্জন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। যার ফলে দেখা যায় কিশোর কিশোরীদের মধ্যেই অপুষ্টিজনিত (Malnutritional) রোগের লক্ষণ সব থেকে বেশী। বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন 1 থেকে 3 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ওজন ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ, তারপর 3 বছর থেকে 10 বছর বয়স পর্যন্ত ভারতীয় মান অনুযায়ী দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার বাৎসরিক 4·5cm—5cm এবং ওজন বৃদ্ধির হার 2·0—2·5 কিলোগ্রাম। অতি শৈশব ও কৈশোরের মধ্যবর্তী এই সময়ের মধ্যে অপুষ্টির সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে কম। আবার শৈশবে অপুষ্টির সম্ভাবনা থাকে কৈশোরকালের চেয়ে বেশী কারণ শৈশবে দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির হার থাকে কৈশোরের হারের থেকে বেশী অথচ ওজন বৃদ্ধির হার শৈশবে ও কৈশোরে প্রায় সমতুল্য। শৈশবে অপুষ্টির কারণ আরো একটি বলা যেতে পারে—শৈশবে খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ভর করে যে শিশুকে খাওয়ায় তার ওপর কিন্তু কৈশোরে কোন্ খাদ্য কতটা খাওয়া উচিত বা অনুচিত এই বিচার ক্ষমতা এই বয়সে কিছুটা এসে যায় এবং খাদ্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়, তাই তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ ক'রে অপুষ্টি দূর করে।

একটি কিশোরের ওজন বৃদ্ধি সাধারণতঃ মেদ ও অস্থি বৃদ্ধির ফলে ঘটে থাকে অথচ একটি কিশোরীর ক্ষেত্রে ইহা চর্বি (Fat) বৃদ্ধিজনিত।

খেলাধূলার চর্চা ও বিকাশ সাধারণতঃ কৈশোরেই ঘটে থাকে আগেই বলেছি। সে সময় খাদ্য সম্বন্ধে ঠিকমতো জ্ঞান না থাকলে শরীর তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে দেহ পরিশ্রম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে খেলোয়াড়ী জীবনে ইতি ঘটে। সময় সময় খেলোয়াড় কঠিন অসুখের শিকার হয়ে পড়ে। আবার

প্রয়োজন অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলেও ফল ভাল হয় না, দেহের ওজন অযথা বৃদ্ধি পেতে পারে, সে ক্ষেত্রেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই বৈজ্ঞানিকরা শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী মোটামুটিভাবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এই খাদ্য তালিকাকে আমরা সুষম খাদ্য (Balanced or Ideal Diet) বলতে পারি। খাদ্য তালিকায় যাবার আগে আমি মনে করি খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি, তাদের ভূমিকা ইত্যাদি সংক্ষেপে তোমাদের জানা দরকার।

খাদ্যবস্তু সাধারণতঃ পুষ্টিকর (Nutrients) উপাদান দ্বারা গঠিত। এই পুষ্টিকর উপাদানগুলিকে আবার ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। দেহের গঠনে ও দেহকে মজবুত করে গড়ে তোলার জন্যে এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন। ইহারা যথাক্রমে (১) প্রোটিন (২) কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় পদার্থ (৩) চর্বি ও তেল (৪) ভিটামিন (৫) খনিজ লবণ (৬) জল।

(১) **প্রোটিন :** প্রোটিন খাদ্যের এক অপরিহার্য উপাদান। কারণ একমাত্র প্রোটিন থেকেই অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino Acid) দেহ পেতে পারে যা দেহ নিজে তৈরী করতে অক্ষম। অ্যামাইনো অ্যাসিড আবার (i) দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সময় নতুন কোষ (Cell) ও টিস্যু (Tissues) উৎপন্নে সাহায্য করে (ii) কোষ ও টিস্যুর গঠন (Structure) বজায় রাখে (iii) দেহ অভ্যন্তরে উৎসেচক (Enzyme) ও হরমোন উৎপন্নে কাঁচামাল (Raw material) হিসেবে ব্যবহৃত হয় (iv) দেহে প্লাজমা প্রোটিন (Plasma Protein) ও হিমোগ্নোবিনের স্বাভাবিক গাঢ়তা (Concentration) বজায় রাখে। (তাছাড়া, অন্তঃসত্ত্বা ও দুগ্ধদান সময়ে যথাক্রমে ভ্রূণের ক্রমিক বৃদ্ধিপর্বে ও শিশুর খাদ্যে পুষ্টি যোগায়)। অতএব প্রোটিন আমাদের দৈনন্দিন আহারের অংগ হওয়া উচিত।

(২) **কার্বোহাইড্রেট :** খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকাও প্রোটিনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার প্রধান উপাদান কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। দেহের প্রয়োজনের মোট শক্তির পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে। ইহা দেহে টিস্যু সংরক্ষণে, পুষ্টি ও সংস্কার সাধনে প্রোটিনকে সহায়তা করে। কার্বোহাইড্রেটের অভাব ঘটলে দেহে প্রোটিনের বিয়োজন শুরু হয়।

(৩) **ভিটামিন :** ভিটামিন এমন এক ধরনের পদার্থ যা দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বজায় রাখতে খাদ্যে প্রয়োজন মতো থাকা দরকার। দেহ ভিটামিন উৎপন্ন করতে পারে না। দ্রবণীয়তা অনুযায়ী ভিটামিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (i) চর্বিতে দ্রবণীয় (Fat solubie) ভিটামিন, ভিটামিন A.D. E ও K এই জাতীয় এবং (ii) জলে দ্রবণীয় (Water Soluble) ভিটামিন, ভিটামিন B-Complex ও C এই জাতীয়। দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ভিটামিন দেহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

(৪) **চর্বি, তেল :** চর্বি ও তেল জাতীয় পদার্থ দেহকে শক্তি ও উষ্ণতা প্রদান করে।

(৫) **খনিজ লবণ :** দেহের স্বাভাবিক কার্য বজায় রাখার জন্যে কয়েকটি মৌলের প্রয়োজন অপরিহার্য। বহিঃকোষীয় রসের (Extra Cellular fluid) সংরক্ষণের জন্যে দরকার হয় সোডিয়াম ও ক্লোরিনের ; ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম-এর দরকার ধমনী ও শিরার টিস্যুর সংরক্ষণে ; তামার ও লোহার প্রয়োজন রক্তে লোহিত কণিকার উৎপাদনে, পটাসিয়ামের দরকার কোষের বিভিন্ন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্যে ; দস্তার প্রয়োজন দ্রুত ক্ষয় পূরণ ও মেরামতির কাজে।

অতএব তাকেই আমরা সুষম খাদ্য বলব যা দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী, দেহকে সুস্থ সবল নীরোগ ও কর্মক্ষম রাখার জন্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, চর্বি ও তেল এবং প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ সমৃদ্ধ। যেমন প্রতি কিলোগ্রাম দেহ ওজনে প্রতিদিন ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। খাদ্যের গুণমান মাপা হয় 'ক্যালরি' এই একক-এর সাহায্যে। ক্যালরি তাপের একক। অর্থাৎ খাদ্য থেকে উৎপন্ন তাপ পরিমাপের মাধ্যমেই খাদ্যের গুণমান মাপা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১ আউন্স চিনি দেহকে ১০০ ক্যালরি তাপ প্রদান করে। নিম্নলিখিত ১নং তালিকার সাহায্যে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় দৈনিক তাপ প্রকাশ করা যেতে পারে।

বয়স	প্রয়োজনীয় ক্যালরি
বছর ১—৩	প্রতিদিন ১৩০০
৪—৯	১৩০০—২৪০০
১০—১২	২৫০০
১৩—১৫	৩০০০
১৬—১৯	৩৪০০
২৫	৩১০০

১নং

অতএব দেখা যাচ্ছে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ্যেই দেহে খাদ্য শক্তির প্রয়োজন হয় সর্বোচ্চ। এখন নীচে প্রদত্ত ২নং তালিকা থেকে আমরা জানতে পারব যে একজন কিশোর বা কিশোরীর প্রতিদিন কতটা করে খাদ্যে প্রধান উপাদানগুলির পরিমাণ থাকা দরকার।

* **ভিটামিন A** ঃ প্রাণীজ খাদ্য, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, ডিম, লিভার।
* **ক্যারোটিন** ঃ (দেহেতে ভিটামিন A-তে পরিবর্তিত হয়) সবুজ পাতা সব্জী, গাজর, পাকা আম ও পেঁপে, বাঁধাকপি, বীট্, ডাল, কচুশাক, ওল কপি, নিমপাতা, কমলালেবু।
* **ভিটামিন** B_2, B_1 ঃ ডিম, দুধ ও লিভারে বেশী পরিমাণে।
* **ভিটামিন C** ঃ টাট্‌কা রসাল ফল ও সব্জীতে।
* **ভিটামিন** B_{12} ঃ দুধ, মাছ, মাংস ও লিভারে।
* **ফলিক অ্যাসিড** ঃ টাট্‌কা সবুজ সব্জীতে, লিভার ও ডাল-এ। প্রতি 100 গ্রাম তণ্ডুল জাতীয় পদার্থে, ডালে ও পাতা সমৃদ্ধ সব্জীতে যথাক্রমে 5-12 মাইক্রোগ্রাম (mcg), 23-70 মাইক্রোগ্রাম ও 50 মাইক্রোগ্রাম ফলিক অ্যাসিড বর্তমান।

প্রোটিন	৬০-৭০ গ্রাম	ক্যালসিয়াম	১ গ্রাম
চর্বি	৪০-৫০ গ্রাম	ফসফরাস	১ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	প্রয়োজনীয় ক্যালরি পেতে বাকী যতটা দরকার	ম্যাগনেসিয়াম	২০০-৩৫০ মি. গ্রা.
ভিটামিন A	৩০০০ I. U.	কপার	২ মি. গ্রা.
ভিটামিন B_1	১·৫ মি. গ্রা.	দস্তা (Zinc)	এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি
ভিটামিন B_2	১·৭ মি.গ্রা.	সোডিয়াম	১০-১৫ মি. গ্রা.
ভিটামিন B_{12}	০·৫-১ মাইক্রোগ্রাম	পটাসিয়াম	প্রায় সোডিয়ামের সমান
নিকোটিনিক এসিড	১৫-১৭ মি. গ্রা.	আয়রন	১০-১৫ মি. গ্রা.
ফলিক এসিড	১০০ মাইক্রোগ্রাম	আয়োডিন	০·১৫-০·৩০ মি. গ্রা.
ভিটামিন C	৩০-৫০ মি. গ্রা.	ফ্লুরিন	জলে ০·৮ Ppm থাকা দরকার
ভিটামিন D	২০০-৪০০ I. U.	অ্যাসিড	ক্ষার প্রশমনে দরকার অনুযায়ী

২নং

খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম দেহকে ক্ষার উৎপন্নে সাহায্য করে ; আবার ফসফরাস, ক্লোরিন অম্ল উৎপাদন করে।

এখন দেখা যাক্ ভিটামিন, খনিজ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ আমরা কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তুর মধ্যে পেতে পারি।

* **ভিটামিন D** ঃ মাছ, লিভার প্রধান উৎস। সূর্যালোকের সাহায্যেও দেহ যথেষ্ট পরিমাণে ইহা উৎপন্ন করে।
* **আয়রন** ঃ ডাল, তণ্ডুলজাতীয় পদার্থে, পেঁয়াজ, মাছ (ভেটকী, চিংড়ী, পার্শে, তপ্‌সে), ডিম, লিভার, কলা, নারকেল।

* **ফসফরাস** ঃ ডিম, দুধ, বাদাম ও তৈলবীজে, পটল ও গাজরে, মুগডাল, সয়াবীন, জাম ও ডুমুর।
* **কপার** ঃ মুগডাল, তেঁতুল, পটল, জোয়ার, মটরশুঁটি, চিংড়ি ও তোপসে মাছ।
* **ক্যালসিয়াম** ঃ দুধ. সয়াবীন, ফুলকপি, মুগডাল, কলাইডাল, নটেশাক, কচু, ওলকপি, তিল, ডুমুর, মাছ (সর্বোচ্চ)।
* **ম্যাগনেসিয়াম** ঃ নারকেল, তণ্ডুল ও ডাল-এ, নটে-শাক, সবুজ পাতা সব্জীতে।
* **সোডিয়াম** ঃ গম, ডাল (মুসুর ডালে সর্বোচ্চ), শাক, (নটে, ধনে, মেথি), ফুলকপি, ওলকপি. আনারস, মাছ (ভেটকি. মাগুর, রুই), মাংস, কাঁঠাল ও নারকেল।
* **পটাসিয়াম** ঃ বিশেষতঃ গম, ডাল (মুগ, অড়হর), শাক (নটে, পালং), আলু, কচু, বেগুন, বীন, বেল, প্রায় সব ফলে, নারকেল (সর্বোচ্চ)।
* **আয়োডিন** ঃ পানীয় জলে, মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্যে।

এইবার একজন খেলোয়াড়-এর প্রতিদিন আদর্শ সুষম খাদ্য কি হওয়া উচিত তা নিম্নলিখিত তালিকা ৩নং-এ প্রকাশ করা হলো।

হয়। বেশী ভাজা অথবা মশলাযুক্ত খাবার দেহের অপকার করে এবং হজমে অসুবিধা ঘটায়। সেইজন্যে খেলোয়াড়-গণের উচিত স্বাস্থ্য গঠনের পথে, খেলোয়াড়ী জীবন গঠনের পথে যথাসম্ভব সেদ্ধ করা বা কম মশলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা। যাতে দেহ যথাযথ ভাবে খাদ্যস্থিত উপাদানগুলি পেতে পারে এবং হজমে কোনরকম বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। রান্না পদ্ধতি যেমন খাদ্য উপাদানগুলিকে স্বাদ, গন্ধ প্রদান করে, সহজপাচ্য করে তোলে, জলীয় অংশ ও আয়তনের হ্রাস ঘটায়, জীবাণু মুক্ত করে, নরম ও চিবানোর উপযোগী করে এবং উচ্চ আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রোটিন ভেঙ্গে নিম্ন আণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রোটিনে পরিবর্তিত ক'রে বিপাকের উপযোগী করে তোলে, তেমন আবার (১) সব্জী সেদ্ধ করে জল ফেলে দিলে বা বেশী নুন ব্যবহার করলে প্রোটিন নষ্ট হয়। (২) ভিটামিন B_2 ও ভিটামিন C নষ্ট হয়, (৩) সোডা জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করলে ভিটামিন B_1 নষ্ট হয় (৪) সেদ্ধ করা জল ফেলে দিলে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নষ্ট হয় (৫) বেশী কুচালে বা শুকোলে খাদ্য উপাদান নষ্ট হয় (৬) মেশিনে খোসা ছাড়ালে ভিটামিন B_1, নিকোটিনিক অ্যাসিড, ভিটামিন

খাদ্যের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালরি	মন্তব্য
তণ্ডুল খাদ্য (চাল / আটা)	450	চাল-36 আটা-54	1570	মোটামুটি এই খাদ্য তালিকা প্রতিদিন দেহকে 2600-2800 ক্যালরি তাপ প্রদান করে। অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় হলে উল্লেখিত পরিমাণগুলি বাড়ান যেতে পারে তবে চর্বি বা তেল জাতীয় পদার্থ না বাড়ানোই যুক্তিযুক্ত।
ডাল	70	14	240	
চর্বি-তেল	40	—	360	
সবুজপাতা যুক্ত সব্জী	100	3-4	50-100	
অন্যান্য সব্জী	75	1-1·5	8-10	
মূলজাতীয় সব্জী	100	1-1·5	100-125	
ফল	30	সামান্য	20-50	
মাছ ও মাংস	30	12-15	60-100	
ডিম	1টি 50 gr.	7	90	
দুধ	150-200	4·8-6·4	100-140	
চিনি-গুড়	40	—	150	

৩নং

তালিকায় উল্লেখিত খাদ্যবস্তুগুলিকে আমরা কাঁচা খেতে পারি না। এগুলিকে রান্নার মাধ্যমে খাদ্যোপযোগী করে নিতে হয়। আবার রান্নার পদ্ধতির উপর খাদ্য-বস্তুগুলির খাদ্যস্থিত উপাদান সমূহের গুণাগুণ পরিবর্তিত B_2, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও প্রোটিন নষ্ট হয়। সুতরাং একজন খেলোয়াড়কে এসব দিকেও সমান নজর দিতে হবে। আমার খেলোয়াড় ভাইবোনেরা, আশা করি আমার এ প্রবন্ধ তোমাদের কাজে লাগবে।

৩৪, অঞ্জুমান আরা বেগম রো, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

ভারতের প্রথম সঞ্চার উপগ্রহ অ্যাপ্‌ল

বিমান বসু

অ্যাপ্‌লের নাম এখন সকলের মুখে মুখে। কা'র বিষয় বলছি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। হ্যাঁ, ভারতের তৈরী প্রথম দূরসঞ্চার উপগ্রহটির কথাই বলছি। তোমরা জানো, এটি ছাড়া হয়েছিল গত ১৯শে জুন ফরাসী গায়নার কুরু থেকে, ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার 'অ্যারিয়েন' নামক রকেটের সাহায্যে। তারপর দীর্ঘ ২৭ দিন ধরে ক্রমাগত এটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বৈজ্ঞানিকরা। অবশেষে, গত ১৬ই জুলাই তাঁরা সফল হলেন উপগ্রহটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার ওপরে ১০২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ভূসমলয় কক্ষে তার পূর্বনির্ধারিত স্থানে স্থাপন করতে। এ সাফল্য ছিল মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের এক বিরাট পদক্ষেপ। মনে রেখো, ভারতের আগে মাত্র চারটি উন্নত দেশ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও ক্যানাডা এরকম উপগ্রহ নির্মাণ ও তা ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করতে পেরেছে।

তোমরা অনেকে হয়তো জানতে চাইবে যে আমাদের আগের ক'টি উপগ্রহ—আর্যভট্ট, ভাস্কর ও রোহিণীর সঙ্গে অ্যাপলের পার্থক্যটা কোথায়। পার্থক্য অনেক। যেমন ধরো ওজনের বেলায়। অ্যাপলের ওজন ছাড়বার সময় ছিল প্রায় ৬৭০ কিলোগ্রাম। সে তুলনায় রোহিণীর ওজন ছিল মাত্র ৩৬ কিলোগ্রাম। আর্যভট্ট ও ভাস্করের ওজন রোহিণীর তুলনায় বেশী ছিল, কিন্তু তা ছিল অ্যাপলের তুলনায় অনেক কম।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এদের কক্ষপথের দূরত্বের বেলায়। আগের সব ক'টি উপগ্রহই ছাড়া হয়েছিল পৃথিবীর নিকট কক্ষপথে যার দূরত্ব ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে। আর সেগুলির পৃথিবী পরিক্রমা করতে সময় লাগতো মাত্র দেড় থেকে দু' ঘণ্টার মত। সে তুলনায় অ্যাপলের দূরত্ব হলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার। এই দূরত্বের কক্ষপথে উপগ্রহটির পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করতে সময় লাগে ঠিক ২৪ ঘণ্টা। এখন তোমরা যদি মনে রাখো যে পৃথিবীর নিজের অক্ষে একবার ঘুরতেও ঠিক ঐ একই সময় লাগে তবে বুঝতে পারবে যে ঐ অবস্থায় উপগ্রহটিকে কেন পৃথিবী থেকে স্থির মনে হয়।

এছাড়া আর এক পার্থক্য হলো অ্যাপলের ব্যবহারিক প্রয়োগে। আগের সবকটি উপগ্রহই ছিল কেবলমাত্র উপগ্রহ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। অ্যাপল হলো ভারতে তৈরী প্রথম সঞ্চার উপগ্রহ যা দেশে অভ্যন্তরীণ টেলিযোগাযোগ এবং দূরসঞ্চারের জন্য ব্যবহার করা হবে। এর আগে আমাদের দেশে উপগ্রহ মারফৎ দূরসঞ্চারের যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে সেগুলির সব কটিতেই ব্যবহার করা হয়েছে বিদেশী দূরসঞ্চার উপগ্রহ।

অ্যাপলের ডিজাইন ও গঠনের ভার ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্গালোরে স্থিত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বৈজ্ঞানিকদের হাতে। তৈরীর পর ব্যাঙ্গালোরেই উপগ্রহটির সমস্ত যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তারপর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাপলকে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্রান্সের

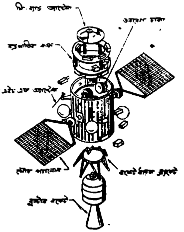

অ্যাপল্‌-এ কোথায় কি আছে

টোল্যুজ শহরে যেখানে আর এক প্রস্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সমস্ত পরীক্ষণের পর উপগ্রহটিকে ছাড়বার কথা ছিল গত ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু সে সময় অ্যারিয়েন রকেটের যন্ত্রপাতিতে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তা স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে গত ১৯শে জুন সেটিকে ছাড়া হয়। কুরু থেকে ছাড়বার পরই উপগ্রহটি নিয়ন্ত্রণের ভার চলে আসে ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীদের হাতে। এ

জন্য বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে মাদ্রাজের কাছে শ্রীহরিকোটায় যার নাম অ্যাপল মিশন কনট্রোল সেন্টার।

অ্যারিয়েন রকেট থেকে বিছিন্ন হবার পরই কিন্তু অ্যাপল সরাসরি ভূসমলয় কক্ষে পৌঁছে যায় নি। প্রথমে সেটিকে স্থাপন করা হয় একটি উপবৃত্তাকার 'স্থানান্তরণ' কক্ষে পৃথিবী থেকে যার দূরত্ব ছিল ২০০ কিলোমিটার থেকে ৩৫,৮০০ কিলোমিটারের মধ্যে। ঐ স্থানান্তরণ কক্ষ থেকে ভূসমলয় কক্ষে অ্যাপলকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি বুস্টার রকেটের সাহায্যে যেটা ছিল ভারতেই তৈরী।

অ্যাপল যখন প্রথমে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করা হয় তখন সেটা ছিল প্রায় ১০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আফ্রিকার গ্যাবনের ওপর। সেখান থেকে এটিকে ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে সরিয়ে আনা হয় ১০২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের ওপর। এর জন্য অ্যাপলের বিশেষ হাইড্রোজিন থ্রাস্টার ব্যবহার করা হয়।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। ভূসমলয় কক্ষে কোনও উপগ্রহ স্থাপন করতে হলে তা হতে পারে কেবল-মাত্র বিষুবরেখার ওপর। যেহেতু বিষুবরেখা ভারতের মধ্য দিয়ে যায় না সে জন্য অ্যাপলকে ভারত ভূখণ্ডের ওপর কোথাও ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করা যেতে পারে না। এছাড়া বিষুবরেখার ওপর ভূসমলয় কক্ষে ইতিমধ্যেই এতগুলি উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে যে প্রায় বলতে পারো যে সেখানে এক রকম 'ট্রাফিক জ্যাম' হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই অ্যাপলকে স্থাপন করা হলো ভারতের মধ্য দ্রাঘিমাংশ ৮২ ½ ডিগ্রী পূর্বের বদলে ১০২ ডিগ্রীতে। এতে অবশ্য বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। কারণ ভূসমলয় কক্ষে স্থিত যে কোনও একটি সঞ্চার উপগ্রহ একসঙ্গে প্রায় ভূপৃষ্ঠের এক তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে যোগা-যোগ স্থাপন করতে পারে। সুতরাং সুমাত্রা দ্বীপের ওপর থাকা সত্ত্বেও অ্যাপল অনায়াসে সারা ভারত ভূখণ্ড জুড়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।

অ্যাপলকে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপনের মত জটিল কাজ তো ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একটা খুঁত রয়ে গেল। তোমরা জানো যে মহাকাশে যে কোনও উপগ্রহের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিদ্যুৎ সর-বরাহ করা হয় সৌরকোষের দ্বারা যাতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। সাধারণত সৌর-প্যানেলগুলি আকারে বড় হয় বলে উপগ্রহ ছাড়বার সময় সেগুলিকে পাখির ডানার মত গুটিয়ে রাখা হয়। পরে উপগ্রহ কক্ষে পৌঁছে গেলে বিশেষ বেতার সংকেত পাঠিয়ে সেগুলিকে মেলে দেওয়া হয়। অ্যাপলের বেলাতেও ছিল তাই। এর দুটি সৌর প্যানেল থেকে মোট ২৪০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুটির মধ্যে কেবল একটি সৌরপ্যানেল মেলতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা সফল হয়েছেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অন্যটি কিছুতেই খোলা গেল না। অবশ্য মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকদের মতে এতে অ্যাপলের নির্ধারিত কার্যসাধনে খুব একটা অসুবিধে হবে না।

এবার তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে অ্যাপলের দ্বারা কি কি পরীক্ষা চালানো হবে। প্রথমেই বলেছি যে অ্যাপল হলো একটি সঞ্চার উপগ্রহ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এর ব্যবহার প্রধানতঃ দূরসঞ্চারের জন্যই করা হবে। এর জন্য অ্যাপলে আছে দূরসঞ্চারের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি যা টেলিভিশন প্রসারণ ও টেলি-যোগাযোগ স্থাপন ছাড়াও নানাভাবে ব্যবহার করা যাবে।

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। উপগ্রহের মাধ্যমে দূরসঞ্চারের কল্পনা প্রথম আসে বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক আর্থার ক্লার্কের মাথায়। ১৯৪৩ সালে, মানে প্রথম স্পুটনিক ছাড়ারও প্রায় দু'দশক আগে, তিনি তাঁর এক কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে এরকম একটা সম্ভাবনার প্রথম উল্লেখ করেন। তখন অবশ্য কেউ ভাবতেই পারে নি যে ক্লার্কের সেই স্বপ্ন সত্যিই একদিন বাস্তব হবে।

দূরসঞ্চারের জন্য উপগ্রহ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এক সঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকা cover করা। তোমরা বোধহয় জানো যে দূরদর্শন কেন্দ্রগুলির প্রসারণ ক্ষেত্র নির্ভর করে তার প্রসারণ অ্যান্টেনার উচ্চতার ওপর। অ্যান্টেনার উচ্চতা যত বেশী প্রসারণ ক্ষেত্রও হবে তত বেশী। এই যুক্তি অনুসারে ভূসমলয় কক্ষের উপগ্রহ কাজ করে একটা ৩৬,০০০ কিলো মিটার উঁচু প্রসারণ অ্যান্টেনার মত যার প্রসারণ ক্ষেত্র হলো ভূপৃষ্ঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকা।

কার্যতঃ অ্যাপল হলো মহাকাশে একটি 'রিলে' স্টেশন যার কাজ হলো বিভিন্ন ভূকেন্দ্র থেকে তরঙ্গ গ্রহণ ক'রে, তা পরিবর্ধিত করার পর পুনরায় ভূকেন্দ্রগুলিকে প্রেরণ করা। এর জন্য অ্যাপলে আছে শক্তিশালী 'সি-ব্যাণ্ড' ট্রান্সপণ্ডার যা ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। অ্যাপলের সাহায্যে দেশজুড়ে কেবলমাত্র টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, একযোগে টেলিভিশন প্রসারণ করাও সম্ভব হবে। তখন

আমরা কলকাতায় বসেই দিল্লী, বোম্বাই বা মাদ্রাজের টেলিভিশন প্রোগ্রাম সরাসরি দেখতে পাবো।

দেশব্যাপী টেলিভিশন প্রসারণ ছাড়াও আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে আছে একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রসারণের অভিনব পরীক্ষা, দূরবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে সংবাদ সরবরাহ সেবা স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসেবা ও জনশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা।

আমাদের রেল বিভাগ অ্যাপলের মাধ্যমে রেল চলাচলের ওপর নজর রাখা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করবে। আরও এক অভিনব পরীক্ষা হবে আমাদের পাঁচটি আই আই টি'র ছাত্রদের নিয়ে। এই পরীক্ষায় অ্যাপলের সাহায্যে একই সঙ্গে দিল্লী, কানপুর, খড়্গপুর, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বসে আই আই টি'র ছাত্ররা বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখতে পারবে। আবার শুধু তাই নয়। বক্তৃতার পর যে কোনও কেন্দ্রের ছাত্র সরাসরি যে কোনও বিশেষজ্ঞকে অ্যাপলের মারফৎ প্রশ্ন করবার সুযোগও পাবে। মানে এক কথায় বলা যায় যে অ্যাপল সারা দেশকে একটা বিরাট ক্লাসরুমে পরিবর্তিত করে দেবে।

অ্যাপলের সাহায্যে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে প্রায় দু'বছর ধরে। আমাদের বিজ্ঞানীরা আশা করেন এই পরীক্ষণের ফলে দূরসঞ্চার উপগ্রহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন যা ভবিষ্যতে আমাদের 'ইনস্যাট' উপগ্রহ ব্যবহারে সহায়তা করবে।

৭ ইউ. এফ্ কলেজ রোড
নিউ দিল্লী-১

"অ্যাপলে কবে কি হলো"

১৯ জুন ফরাসী গায়েনার কুরু থেকে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬-০২ মিঃ অ্যারিয়েন রকেটের সাহায্যে ছাড়ার পর অ্যাপলকে স্থানান্তরণ কক্ষে স্থাপন করা হলো।

২২ জুন বুস্টার রকেট প্রয়োগ করে অ্যাপলকে আফ্রিকার গ্যাবনের ওপর ১২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের নিকট ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করা হলো।

অ্যাপলের সৌর প্যানেল দুটি খুলতে গিয়ে সমস্যা

২৩ জুন প্রায় ৩২ ঘণ্টা চেষ্টার পরও অ্যাপলের আটকে যাওয়া সৌর প্যানেলটি খোলবার চেষ্টা ব্যর্থ। কেবল একটি মাত্র সৌর প্যানেল খোলা গেল।

২৭ জুন চতুর্থবার হাইড্রাজিন থ্রাস্টার প্রয়োগ করার পর অ্যাপলকে ভূসমলয় কক্ষে ১২৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে স্থাপন করা হলো।

১৬ জুলাই ছাড়বার ২৭ দিন পর অ্যাপল ১০২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে সুমাত্রা দ্বীপের ওপর ভূসমলয় কক্ষে তার পূর্বনির্ধারিত স্থানে পৌঁছল।

১৭ জুলাই অ্যাপলের সঞ্চার অ্যান্টেনাটি ভারতের নাগপুরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

২১ জুলাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য টেলিভিশনে আহমেদাবাদ কেন্দ্র থেকে সরাসরি ব্যাঙ্গালোরে প্রসারণ ক'রে অ্যাপলের মারফৎ প্রথম টেলিযোগাযোগ পরীক্ষা শুরু।

ধাঁধা

শুভাশিস্ চৌধুরী

গতকাল আমি ও আমার দুই বন্ধু শুভ্রাংশু ও অমিতাভ এই তিনজন মিলে পিক্‌নিক্ করেছিলাম। পিক্‌নিকে এমন একটা কাঠের উনুন ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে আট টুকরো জ্বালানি কাঠ লাগে। আমার কাছে কোন কাঠ না থাকায় শুভ্রাংশু পাঁচ টুকরো এবং অমিতাভ তিন টুকরো কাঠ দিল। যেহেতু আমি কোন কাঠ দিতে পারিনি, সেইজন্য আমি ওদের আট টাকা দিলাম। এই আট টাকা শুভ্রাংশু ও অমিতাভ—কে কত টাকা করে ভাগ করে নেবে বলতো?

(উত্তর ৪১ পাতায়)

বিজ্ঞানের ভেলকি

যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার

দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে অনেকবার, অনেক অনেক জায়গায় আমাকে নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থার সামনা-সামনি দাঁড়াতে হয়েছে। অনেকে অনেক ভাবে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে—নিতে চেয়েছে আমার যাদু নৈপুণ্য আর বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা। ভগবানের অনুগ্রহে আর আমার যাদু বিজ্ঞান আর ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের কল্যাণে সব চ্যালেঞ্জই আমি পার হয়ে আসতে পেরেছি বিশেষ সফলতার সঙ্গে।

সাধারণ লোক ধরেই নেন যে যাদুকরেরা একটু বেশী মাত্রায় চতুর। তাঁদের বিশ্বাস, এত এত বুদ্ধিমান দর্শককে যারা অতি সহজে বোকা আর হতবুদ্ধি করে ফেলেন চোখের পলকে, তাঁরা চতুর চূড়ামণি না হয়ে যায় না। তাই তো তাঁরা সব সময়েই যাচাই করে বাজিয়ে নিতে চান যাদুকরকে সুযোগ পেলেই। যিনি বিচক্ষণ কৃতবিদ্য যাদুকর তিনি সহজেই তাঁর ব্যক্তিত্ব আর কৃতিত্বের জোরে অতিক্রম করে যান এই সব পরীক্ষা আর চ্যালেঞ্জের বেড়াজাল।

ফরাসী দেশে থাকাকালে সেবার প্যারিসে এক ঘরোয়া পার্টিতে আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল এমনি এক মজার পরীক্ষার। ফরাসী সাংবাদিক বন্ধুরা আমার সম্মানে আয়োজন করেছেন এক ভোজসভার। ভোজন পর্ব শেষ হতে এক প্রবীণ সাংবাদিক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তাঁর সামনে পড়ে থাকা এক গ্লাস জলের দিকে। প্রায় গলা গ্লাস জল, তাতে ভাসছে একটা বরফের চৌকো টুকরো। গ্লাসের কাছেই পড়ে রয়েছে সসের পাত্র, গোলমরিচদানী আর লবণের পাত্র। একটা মোটা সূতোর টুকরো উঁচু করে ধরে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাদু সম্রাট, অনেক অলৌকিক কীর্তি-কলাপই তো আপনি বিশ্বজুড়ে দেখিয়ে বেড়ান। এইখানে, এই টেবিলের উপরে একটি অতি সহজ-সরল কাজ করে আপনার অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তির একটু পরিচয় দিন না। আমরা দেখে আপনার প্রতিভার প্রতি আরো দশগুণ বেশী শ্রদ্ধান্বিত হই!"

তাঁর কথা শুনে চুপ করে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সরাসরি না ঘোষণা করলেও, বুঝতে বাকী থাকে না যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ! ভগবানের নাম স্মরণ করে সপ্রতিভ ভাবে হাসিমুখে এগিয়ে যাই তাঁর সামনে।

কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলি, "বলুন, কী করতে হবে।"

"এমন কঠিন কিছু নয়। এই সূতোর ডগা দিয়ে বরফটাকে তুলে আনতে হবে গেলাস থেকে। ফাঁস লাগিয়ে বা বেঁধে তোলা চলবে না। ছুরি, চামচ বা কর্ক-এর সাহায্য নেওয়া চলবে না বা হাত দিয়েও ছোঁয়া চলবে না বরফ। ছুঁতে হবে শুধু এই সূতোর ডগা দিয়ে। দরকার বোধ করলে, বাড়তি জল বা এই টেবিলের উপরে যে সব জিনিস আছে তা ঢালা চলতে পারে গ্লাসে বা বরফের টুকরোতে।"

সত্যিই খুব শক্ত পরীক্ষা। সমাধান কোথায় এর? প্রশ্নকর্তা বলেছেন, টেবিলের উপরে যে সব জিনিস পত্র (সস, জল, গোলমরিচের গুঁড়ো আর লবণ) আছে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমি এক মনে ভাবতে থাকি এদের মধ্যে কোন জিনিস বরফের উপর কোন ক্রিয়া করে এদের সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী। হঠাৎ বিদ্যুত ঝলকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। লবণ। লবণই হচ্ছে এই ধাঁধার আসল সমাধান। লবণ প্রয়োগ করলে বরফের হিমাঙ্ক নেমে আসে—এ হচ্ছে তাপ বিজ্ঞানের এক সাধারণ প্রচলিত সত্য। লবণের প্রয়োগেই এই অসম্ভব কাজটাকে সম্ভব করতে হবে। কিন্তু কেমন ভাবে? মস্তিষ্ক স্থির রেখে একবার ভেবে নিই ক্ষণেকের জন্যে।

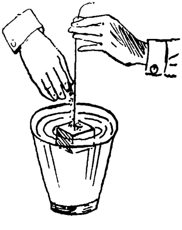

সূতোর ডগাটা একটু জলে ভিজিয়ে নিয়ে তা আমি ঠেকাই ভেসে থাকা বরফের টুকরোটার উপরে। এমন

ভাবে ধরি যাতে সূতোর ভেজা ডগাটার সিকি ইঞ্চি মতন অংশ শুয়ে থাকে বরফের উপরে।

সূতোটার অপর প্রান্ত ধরা থাকে আমার বাঁ হাতে। এরপর ডান হাত দিয়ে লবণের পাত্রটা তুলে নিয়ে আমি একটু খালি লবণ ছিঁটিয়ে দিই এই ভেজা আর শুয়ে থাকা সূতোর প্রান্তটার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় বরফের উপরে লবণের ক্রিয়া। শুয়ে থাকা ভেজা সূতোর দুই পাশে পাশে বরফ গলতে থাকে। এই গলার সময়ে লবণযুক্ত বরফ আশপাশের বরফ থেকে তাপ টেনে নেয় আর সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে থাকা ভেজা সূতোর প্রান্তের জলও তাপ হারায়। এর ফলে ভেজা সূতোর প্রান্ত বরফের উপরে শোয়া অবস্থাতেই জমে গোটা বরফের সঙ্গে এক হয়ে সেঁটে যায়। চোখের সামনে আমি ঘটতে দেখি গোটা ব্যাপারটা, ঠিক যেন ম্যাজিক। সত্যিকারের ম্যাজিকেরই মত এক আজব ব্যাপার।

বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে আমার মুখে। পরিতৃপ্তির আনন্দে ভরে ওঠে আমার সারা মন-প্রাণ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ধীরে ধীরে টেনে তুলি সূতোটা। সূতোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঝুলতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে বরফের চৌকো টুকরোটা উঠে আসে গ্লাস ছেড়ে সবার চোখের সামনে। স্বতঃস্ফূর্ত করতালির ধ্বনিতে মুখর হয় চারদিক। সবাই সমস্বরে আমার জয়ধ্বনি করে ওঠেন। যিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি এগিয়ে এসে আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে জোর গলায় বললেন—"যাদু সম্রাট এ. সি. সরকার, সত্যিই আপনি মহান।"

এ. সি. সরকার (যাদুকর)
সেলিমপুর রোড, ম্যাজিক ভিলা, কলিকাতা-৩১

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। কোন্ মৌলিক গ্যাস সর্বাপেক্ষা ভারী ?

২। ATP বলতে কি বোঝায় ?

৩। কোন্ ভিটামিনে কোবাল্ট থাকে ?

৪। 'ড্রাই-আইস' জিনিসটা কি ?

৫। 1669 খ্রীস্টাব্দে জার্মান কিমিয়াবিদ 'ব্র্যাণ্ড' (Brandt) সূত্র থেকে কোন্ মৌলটি নিষ্কাশন করেন ?

৬। DNA বলতে কি বোঝায় ?

৭। পারমাণবিক চুল্লীতে কোন্ মৌল জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় ?

৮। বায়ু, জল ও ইস্পাতের মধ্যে কোন্ মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ সর্বাধিক ?

৯। 'নিউটন' কিসের একক ?

১০। 'অশ্বশক্তি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে ?

১১। কোন্ কোন্ পদার্থ গলনের ফলে তরলে পরিণত হ'লে আয়তনে সঙ্কুচিত হয় ?

১২। যে সব মৌলিক কণা 'বসু সংখ্যায়ন' মেনে চলে তাদের নাম কি ?

১৩। শ্বাসমূল আছে এমন তিনটি উদ্ভিদের নাম কর।

১৪। তাপ প্রয়োগ করলে কার্বনের রোধের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে ?

১৫। কোন্ ভেষজ উদ্ভিদ থেকে স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন ?

(সমাধান : পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে)

ধাঁধার উত্তর

তোমরা হয়তো ভাবছো এ তো খুবই সহজ—শুভ্রাংশু পাঁচ টাকা ও অমিতাভ তিন টাকা নেবে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ নয়! আমি নিশ্চয়ই জ্বালানি কাঠের জন্য মোট খরচের তিনভাগের একভাগ দেবো। এখন, যেহেতু আমি আট টাকা দিলাম, সুতরাং মোট খরচের তিনভাগের একভাগ হল আট টাকা। অতএব, জ্বালানি কাঠের মোট খরচ $= 8 \times 3 = 24$ টাকা। যেহেতু ঐ উনুনে মোট আট টুকরো কাঠ লাগে, সুতরাং প্রতি টুকরো কাঠের দাম $= 24 \div 8 = 3$ টাকা। শুভ্রাংশু পাঁচ টুকরো কাঠ অর্থাৎ পনের টাকার কাঠ দিয়েছে। আমার মতো প্রত্যেকেরই মোট খরচের তিনভাগের একভাগ খরচ বহন করার কথা। সুতরাং শুভ্রাংশু $15-8=7$ টাকা পাবে। সেইমত, অমিতাভ তিন টুকরো কাঠ অর্থাৎ নয় টাকার কাঠ দিয়েছে। তাই, সে $9-8=1$ টাকা পাবে। অর্থাৎ আমার ঐ আট টাকা থেকে শুভ্রাংশু সাত টাকা ও অমিতাভ এক টাকা পাবে।

গহন রাতের সূর্য

সিদ্ধার্থ ঘোষ

হায় হায় করে উঠল রজত। কোন মানে হয়। ঠিক যেন সময় বুঝে লোড্ শেডিংটা হল। বেয়াড়া রসিকতার মতো।

'কি গো ছোট্‌কা! তুমি যে এত বলছিলে, একী তোমাদের কলকাতা! তোমাদের এখানে নাকি লোড্ শেডিং-এর বালাই নেই!' সন্তু বিছানার ওপর থেকেই বলে উঠল।

'পই পই করে বললুম আগে মাংসটা নিয়ে আয়। এতক্ষণে কবে রান্না হয়ে যেত।' রজত রাগ সামলাতে পারে না। সবে প্রেসার কুকারের ঢাকনিটা লাগিয়ে হিটারে বসাতে যাবে···তিন মাস বাদে মুরগীর মাংস খাবার সুযোগ পেয়েও এরকম ভাবে বান্‌চাল হবার উপক্রম হলে কার না রাগ হয়! কম কসরত করতে হয়েছে! সন্তুটা পূজোর ছুটিতে বেড়াতে না এলে অবশ্য মা-কে ম্যানেজ করা সম্ভব হত না। হিঁদুর ঘরে মুরগী! ডাক্তারের ভুয়ো সার্টিফিকেট দেখিয়ে বোঝাতে হয়েছে মুরগীর মাংস না খেলে বংশের কুল প্রদীপ এক মাত্র নাতির প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এতে আর কোন্ ঠাকুমার না মন ভেজে। কিন্তু মন ভিজলেও হিটার কিনে আনতে হয়েছে। প্রেসার কুকার আলাদা হয়ে গেছে। এখন যদি লোড্ শেডিং ঘণ্টা দুয়েক চলে তাহলেই চমৎকার। এই ছোট শহরে চাকরি নিয়ে আসাটাই কাল হয়েছে। সারাক্ষণ মায়ের নজরে নজরে—এমন একটা রেস্তোরাঁ নেই—

'অ্যাই অ্যাই সন্তু—ওকী হচ্ছে! মোমবাতি খাটের ওপর উল্‌টে পড়লে—' ধমকে উঠল রজত। বই বই করেই ছেলেটার দফা গয়া হয়ে যাবে। মোমবাতি জ্বেলে লেপের মধ্যে ঢুকে বই পড়ার চেষ্টা! ইয়ার্কি। রজতের সব রাগ গিয়ে পড়ে বইয়ের ওপর। ওই বইটা নিয়ে মশগুল না হয়ে সন্তুটা যদি এক ঘণ্টা আগে মাংসটা নিয়ে আসত! দূর—দূর—কোনো কম্মের নয়—

'এই বই ছাড় বলছি—এই অন্ধকারে পড়ে আর চোখের মাথা—'

'প্লিজ, প্লিজ ছোটকা—আর দুটো পাতা—ভীষণ, ভীষণ ইন্টারেস্টিঙ—ব্র্যাড্‌বেরির গল্পগুলো—'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে হাল ছেড়ে দিল রজত। সন্তুটা গোল্লায় গেছে। ট্যাঁশ স্কুলে পড়লে এই হয়। দিনরাত মুখে ইংরেজী বই। জঘন্য। কে বলবে ক্লাশ টেনে পড়ে। দাদা বৌদির ওপরে রাগ হয় রজতের। তারপর মায়ের ওপর; যত দোষ মুরগীর মাংসের ওদিকে মুরগীর মাংসখেকোদের স্কুলে নাতির পড়ানোর ব্যাপারে তো কই···

বারান্দায় বেরিয়ে এল রজত। মা-কে একবার বলবে নাকি কোরাসিনের স্টোভটা দেবার জন্য। কাল না হয় নতুন একটা···উহ্ কী কন্‌কনে হওয়া! রজত ঘরে ঢুকে আলনা থেকে র‍্যাপারটা টেনে নিতে গিয়ে চেয়ারটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। উফ্—

'লাগল? লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নাও না ছোট্‌কা—সঞ্জু বইয়ের পাতা থেকে মুখ না খুলেই অ্যাড্‌ভাইজ করল।

কড়ে আঙুলে হাত বোলাতে বোলাতে রজত চেঁচিয়ে উঠল, 'অয়েল ইওর ওন্ হুইল্!' ঠাণ্ডার দিনে লাগলে একেবারে কন্‌কনিয়ে ওঠে। কিন্তু লণ্ঠন জ্বেলে হবেটা কি! লণ্ঠনের আলোয় কি মাংস সেদ্ধ হয়?

'মারো গুলি! কারুরই যখন কোন ইন্টারেস্ট নেই। শুধু আমিই বা ভাবি কেন!' মনে মনে বকবক করতে করতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রজত। 'থাক্ আজ ভাত আর ডাল খেয়ে! নাঃ কলকাতার সব রেস্তোরাঁ উঠে যাবে। সীওরলি উঠে যাবে—লাহোর, নিজাম, সাবির! সব! নেকসট জেনারেশান যদি সঞ্জুদের মতো হয়। না উঠে উপায় আছে!'

মায়ের ঘরটা অন্ধকার। শুয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি। আজ মায়ের খাওয়ার পাট নেই। অমাবস্যার উপোস। পারেও। রজত ভাবল একবার ঢুকে দ্যাখা যেতে পারে, ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। যদিও সেটা একটা ইম্পসিব্‌ল্ অ্যাসামপ্‌শন! রাত বারোটার আগে কখনোই মায়ের চোখে ঘুম আসার সম্ভাবনা নেই। সারাদিন তো উপোস করেছে তারপরেও যে কেন চোখে ঘুম আসে না বুঝতে পারে না রজত।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই রজত চমকে গেল। এমন আলো আলো লাগছে কেন? আজ অমাবস্যা না? নাকি আকাশে

মেঘ ছিল এতক্ষণ এখন কেটে যাচ্ছে বলে…না না, মোটেই তা নয়—এত আলো—

রজত রেলিং দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ওই তো চাঁদ উঠেছে—একেবারে পরিষ্কার গোল থালার মতো। অমাবস্যা কোথায়, বরং পূর্ণিমা বলে মনে হচ্ছে। নারকোল গাছটার ছায়া এসে পড়েছে বারান্দায়। বেশ জবরদস্ত ছায়া। মানে সাদা-কালোর ভেদ রেখাটা বেশ স্পষ্ট। টিকিতে ফুল গোঁজা পুরুতটা নিশ্চয় ভুল করেছে।

রজত ঘরে ঢুকে মা-কে ডেকে বলল, 'ওমা! তুমি যে বললে আজ অমাবস্যা!'

'তাতে ক্ষতি কি হল শুনি?'

'আহা, ক্ষতির কথা কে বলছে! অমাবস্যার রাতে ফুটফুটে চাঁদ উঠছে সেই কথাটাই বলছি। না হলে আর কি?

পূর্ণিমা হলেও তোমার উপোস, অমাবস্যা হলেও…'

'মেলা বক্‌বক্‌ করিসনি তো! সব সময় ইয়ার্কি না!' মা লেপ সরিয়ে উঠে বসে।

'আমি ইয়ার্কি করছি! নিজে এসে দেখে যাও! তোমার তো যত ভক্তি ওই ভণ্ড পুরুতটার ওপর…'

'চুপ্‌ কর্‌। পুরুতটা ভণ্ড হল আর তুই কি—' মা উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার জানলার দিকে তাকিয়েই থমকে গেল। 'এত বড় ভুল হল! আশ্চর্য! এই রজা, হ্যারিকেনটা জ্বালা তো ক্যালেণ্ডারটা একবার দেখি—'

রজত হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে ক্যালেণ্ডারের সামনে উঁচু করে ধরল।

'এই তো—২৩শে অমাবস্যা—'

'তাই তো!' রজতও অবাক।

'ক্যালেণ্ডারে ভুল! কিন্তু তাই বা হবে কি করে! পূর্ণিমার উপোস তো এই সেদিন—ওরে দে' দে' পাঁজিটা দে তো একবার—'

রজত পাঁজিটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে লণ্ঠনটা পাশে নিয়ে আসার আগেই দেখল, ঘরের আলোতেই পাঁজির খুদে খুদে লেখাগুলোও দিব্যি পড়া যাচ্ছে। লণ্ঠনের দরকার হচ্ছে না।

'ছোট্‌কা—ছোট্‌কা—' বারান্দা থেকে সঞ্জুর চীৎকার কানে আসতেই রজত বারান্দায় ছুটে এল!

ভোরের আকাশের মতো উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদনি রাতের সেই নীলাভ ফ্লুরসেন্ট আলো নয়।

সঞ্জু আকাশের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা চাঁদ হতে পারে না!'

কথাটা মিথ্যে বলেনি সঞ্জু। চাঁদের দিকে তাকালে কি কখনো চোখ ধাঁধিয়ে যায়?

সঞ্জুর কথায় সায় দেবার জন্যই যেন পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটা থেকে সেই ঝগড়ুটে কোকিলটা গলা ছেড়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দূরের কোনো গাছ থেকে তার সঙ্গী উত্তর দিল। কা' কা' করে দু' একটা কাক এগাছ ওগাছ করতে শুরু করেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল রজত। এখন সকাল সাতটা হলেই সব ল্যাটা চুকে যেত। অবাক হবার আর কিছু থাকত না। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। রাত ন'টা পনেরো। এবং আজ অমাবস্যা।

'ছোট্‌কা! নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসান্‌! পালাও! পালাও রেডিও অ্যাক্‌টিভ্‌ ফল্‌ আউট হবে!' হঠাৎ বিকট চীৎকার করে ছুট লাগাল সঞ্জু। রজতও ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে গেল তার পিছন পিছন।

সঞ্জু দরজা খুলে এক ছুটে নিচে চলে গেল।' 'শীগ্‌গির নেমে এসে ছোট্‌কা! ঠাম্মা, ঠাম্মা—ছুটে এসো! প্রাণ বাঁচাতে হলে এই চৌবাচ্চার মধ্যে—'

রজত দেখল সঞ্জু উঠোনের চৌবাচ্চার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ল।

'কি দেখছ দাঁড়িয়ে হাঁ করে! হাইড্রোজেন বোম্ব টেস্ট হচ্ছে—হারি আপ্‌!'

রজত ছুটে এল ঘরের মধ্যে। চারপাশের বাড়ি থেকে শাঁখ বেজে উঠেছে। কান্না চীৎকার আর্তনাদে সারা পাড়া জেগে উঠেছে। মা-ও শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে।

'শীগ্‌গির চলো মা!'

'কোথায় যাব?'

'চৌবাচ্চার জলের মধ্যে। সঞ্জু বলছে—'

ভগবানের নাম নে' বাবা। ভগবানের নাম নে। সব শেষ, সব শেষ হয়ে যাবে—প্রলয় মহাপ্রলয়—কলিযুগের মহাপাপে—'

'বাজে না ব'কে চলো তো মা!' রজত অস্থির হয়ে পড়ে। ঠাকুর দেবতার অশেষ ভক্তির এই দোষ। সঞ্জু নিজে যখন যাই হোক ছেলেটার পড়াশোনা আছে—

'তুই যা বাবা। আমাকে শেষ কটা মুহূর্ত ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখতে দে'।'

মা জপের মালা হাতে ঠাকুরের পায়ে মাথা নিচু করেছে দেখে রজত বুঝল আর কিছু করার নেই।

সারা ঘর এখন যেন দুপুরের রোদে ভাসছে। রাস্তা দিয়ে লোক ছুটছে আর চীৎকার করছে ভয়ে। সব মরবে সব! ভাগ্যিস সঞ্জু জলের ভেতর নাম্‌বার বুদ্ধিটা বাত্‌লেছে, নিশ্চয় বইয়ে পড়েছে। রজত শেষ চেষ্টা করল, 'মা—পাগলামি ক'রো না, চলো!'

মা কোন উত্তর দিল না।

নিচের থেকে আবার সঞ্জুর ডাক কানে এল। রজত ছুটে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সরকারদের গাড়িটার স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এল। তাই তো! কথাটা একবারে খেয়াল হয়নি। এপাড়ায় ওদেরই শুধু গাড়ি আছে। সরকার সাহেবের বুড়ী মা-র সঙ্গে তো মায়ের বেশ আলাপ আছে। মা বললে এক্ষুণি ওরা গাড়িতে তুলে নেবে।

সিঁড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে চেঁচিয়ে উঠল রজত, সরকার সাহেব! আমাদের নিয়ে নিন্। আমরাও যাব! সরকার সাহেব!'

রজতের গলা কিন্তু হাজার খানেক লোকের চীৎকারে ড্‌বে গেছে। গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। গাড়ির ছাদ, বনেট, ক্যারিয়ার—কোন জায়গা বাকী নেই। সবাই পালাতে চাইছে। কিন্তু গাড়ি যাবে কোথা দিয়ে। মানুষের সমুদ্রে আটকা পড়ে আছে। আর সেই সমুদ্র গাড়ির মধ্যে স্থান পাবার জন্যে ব্যাকুল। গাড়ির ইঞ্জিনের রেস্ বাড়িয়ে ঘোঁও ঘোঁও গর্জন ছেড়ে ও ক্রমান্বয়ে হর্ন চেপে ধরেও সরকার সাহেব এক ইঞ্চি এগোতে পারছেন না।

রজত গাড়ি চড়ার আশা ছেড়ে নিচে নেমে এল।

'হারি আপ ছোটকা। এনি টাইম্ এখন—ঠাম্মা! ঠাম্মা এলো না?

চৌবাচ্চার মধ্যে লাফিয়ে পড়েই রজতের খেয়াল হল র‍্যাপারটা অবধি খোলা হয়নি গা থেকে। অত সখের র‍্যাপারটা। শাল মিউজিয়ামের হাজার খানেক শাল নেড়ে চেড়ে তারপর পছন্দ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এখন র‍্যাপারটার জন্য একটুও দুঃখ হচ্ছে না! এমন কি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার কথাও যেন বিস্মরণ!

'ছোট্‌কা টাইম কত হল?'

এক বুক জলে দাঁড়িয়ে রজত ঘড়ি দেখল, 'ন'টা চল্লিশ—'

'তার মানে প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। ইন্টারেস্টিং—'

সঞ্জুর কথা শুনে রজত তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, 'হোয়াট ড্‌ ইউ মিন্?'

'এটা কখনোই পারমাণবিক বিস্ফোরণের ব্যাপার হতে পারে না। তার জন্যে এতক্ষণ সময় লাগবে কেন? ছবি দ্যাখোনি হিরোসিমা নাগাসাকির·'

'নে নে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না!'

'চলো—বাইরে গিয়ে দেখা যাক্, ব্যাপারটা কি!'

'না, না, অত বাহাদুরিতে কাজ নেই!'

'ধ্যাৎ, তুমি না! কোন স্পিরিটই নেই। এই ঠাণ্ডায় চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি কাওয়ার্ডলি ব্যাপার বলতো।' সঞ্জু ছোটকার পারমিশান না নিয়েই উঠে পড়ল।

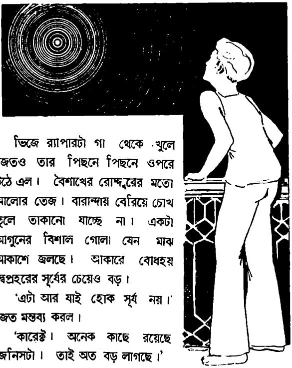

ভিজে র‍্যাপারটা গা থেকে খুলে রজতও তার পিছনে পিছনে ওপরে উঠে এল। বৈশাখের রোদ্দুরের মতো আলোর তেজ। বারান্দায় বেরিয়ে চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না। একটা আগুনের বিশাল গোলা যেন মাঝ আকাশে জ্বলছে। আকারে বোধহয় দ্বিপ্রহরের সূর্যের চেয়েও বড়।

'এটা আর যাই হোক সূর্য নয়।' রজত মন্তব্য করল।

'কারেক্ট। অনেক কাছে রয়েছে জিনিসটা। তাই অত বড় লাগছে।'

রজত দ্যাখে তার কপাল দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। কন্‌কনে শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে ভিজে গিয়েও··· ভাবলেই মাথা খারাপ! রাস্তার কোলাহলে কিছুটা ঝিম ধরছে। চরম উত্তেজনাও এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ জিইয়ে রাখা যায় না।

আধ ঘণ্টা ধরে এই বিচিত্র অগ্নিগোলক আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাপমাত্রাই যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে।

'দ্য আইডিয়া!' সঞ্জুর সঙ্গে থাকতে থাকতে রজতেরও

ইংরেজী বলার বদ অভ্যেস তৈরী হয়ে যাচ্ছে। 'এবার বুঝতে পেরেছি!'

সঞ্জু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'কি বুঝতে পেরেছ?'

'হুঁ-হুঁ'-বল্‌তে তো পারলি না—এটা আসলে বিরাট একটা উল্কা। বিশালতম—অন্য গ্রহ থেকে ছিট্‌কে—'

'মাই গড্। তোমার মতো ননসেন্স—'

'কি বললি?'

'মানে বিজ্ঞানে তোমার সেন্স নেই। উল্কা কখনো মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খায়?'

রজত অনেক কষ্টে তার ডান হাতটাকে আটকে ফেলল সময় মতো। ওই পাকা ছেলেটার মাথায় রাম চাঁটি মারতে পারলে বোধহয়···কিন্তু সেটা কি ঠিক হত? কথাটা তো সঞ্জু মিথ্যে বলেনি। উল্কারা ছুটতেই অভ্যস্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলো ছড়ানো আর তাতানো, এসব অপকম্মো তারা করে না।

'বুঝলে ছোট্‌কা, ডেফিনিট্‌লি এটা একটা ইউ-এফ্-ও। ক্যামেরা আছে?'

'ইউ এফ ও মানে?'

'তাও জানো না? আন্‌আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টস। একটি অজানা উড়ন্ত বস্তু। অন্য কোন গ্রহ থেকে—মহাকাশ থেকে এসেছে—এইচ জি ওয়েল্‌শও পড়োনি? ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্লড্‌স্?'

'মেলা পাণ্ডিত্য ফলাস্‌নি! মোটেই এসব ভাল লাগছেনা।'

'ভাল না লাগলে কি হবে। দেখো তুমি, আমার কথা সত্যি হয় কিনা। হয়তো দেখবে কাঁকড়ার মতো আট হাত পাওলা সব জীব বেরোচ্ছে কিংবা মানুষের মাথা বসানো পাখী,···কিন্তু চেহারা যাই হোক, আমাদের থেকে তারা অনেক ইন্টেলিজেন্ট! ওহ্ ভাগ্যিস তোমার এখানে এসেছিলাম, না হলে তো···'

সঞ্জুর কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ অগ্নিগোলকটা যেন দপ্ করে লাফিয়ে উঠে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকার ঝাঁপ দিয়ে পড়ল আকাশ থেকে। ভয়ার্ত আর্তনাদে ফেটে পড়ল মানুষ। ডিসেম্বরের এক অমাবস্যার রাতে সূর্যোদয় যেমন অলৌকিক তেমনই অলুক্ষণে ব্যাপার সেই সূর্যের এইভাবে নিবে যাওয়া। মোমবাতির শিখার মতো। চোখের নিমেষে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বিজলী আলো জ্বলে ওঠাতে সবাই যেন কিছুটা হাঁফ ছাড়ল। তবু তো পাঁচজনের মুখগুলো দেখা যাবে। ভৌতিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু রাস্তায় কেউ নেই। যে যার বাড়িতে। কে বলতে পারে আবার ওই বিদঘুটে আগুনের গোলাটা জ্বলে উঠবে কিনা। কিংবা আরো নীচে নেমে আসবে কিনা।

সঞ্জু ছুটে বেরিয়ে গেল সরকার সাহেবদের বাড়িতে। ওদের ফোন আছে। যদি কিছু খবর পাওয়া যায়। রজত হিটার জ্বালিয়ে মাংস চড়িয়ে দিয়ে পাশের ঘরে এসে দেখল মা তখনো জপের মালা হাতে ব'সে।

'সারা রাত জপ করে কাটিয়ে দেবে নাকি। শোবে না?'

মা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রজতের দিকে। তারপর মাথা নিচু ক'রে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল।

'আরো নিষিদ্ধ জিনিস খাও। ছি ছি—এসব ম্লেচ্ছাগিরির ফল। বুঝলে? এত পাপ ধরিত্রীর সইছে না। পই পই করে বারণ করলুম, কোনদিন ওসব জিনিস আমাদের চৌকাঠ পেরোয়নি—'

'যাক্ বাবা। যত দোষ গিয়ে পড়ল ওই মুরগী-ছানাটার ওপর! ওর সঙ্গে···আর বলার কিছু নেই! নাও, নাও, শুয়ে পড়ো—এই আমি নাকে খৎ দিচ্ছি আর কোনোদিন খাবার ব্যাপারে নাক গলাবো না। সেদ্ধ ভাত খেয়ে যে ক'টা দিন বাঁচা যায়—'

সঞ্জুর পায়ের আওয়াজ শুনে রজত বেরিয়ে এল, 'কিরে, কিছু খবর পেলি?'

'নাঃ। কেউই কিছু বলতে পারছে না। নিউজ-পেপার, আবহাওয়া বিভাগ—কিচ্ছু জানে না। তবে শুনলাম, টেলেক্সে খবর পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা যাতে ইমিডিয়েটলি ফিল্ড ইন্‌ভেস্‌টিগেশান্-এ আসেন—ও, একটা কথা, এই আগুনের ডেলাটা নাকি মাইল দু'য়েক দূরেও দেখা গেছে!

প্রেসার কুকারটা ফ্যাঁশ করে নিঃশ্বাস ছাড়তেই সঞ্জু লাফিয়ে উঠল, 'করছ কি! আর ইউ ম্যাড্ ছোটকা?!

'তার মানে?'

'তুমি রান্না করছ?'

'তা রান্না করব না কেন? বেঁচে যখন আছি।'

'খবর্দার! আজ কোন খাওয়া-দাওয়া নয়। রিপোর্ট না পাওয়া অবধি জলস্পর্শ করা চলবে না। আগে রেডিও অ্যাকটিভিটির মাত্রা নির্ধারণ করা দরকার মানে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা—তারপর খাওয়া-দাওয়া! আরে, বৃষ্টি পড়ছে নাকি? সঞ্জু এক মিনিট ভুরু কুঁচকে দাঁড়াল; তারপর ছুটে চলে গেল বারান্দায়। ঠিকই শুনেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

সঞ্জু ঘরে ঢুকে বলল, 'তাড়াতাড়ি একটা খালি শিশি দাও তো! কুইক্!'

'খালি শিশি?'

সঞ্জু কোন দিকে না তাকিয়ে কালির দোয়াতটা নিয়ে ছুটে গেল কলঘরে। ভর্তি শিশিটা উপুড় করে ঢেলে দিল নর্দমায়। তারপর আবার জল ভরে বেশ ভাল করে ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। রজতের আর বাধা দেবার শক্তি নেই।

'শিশিটা কেমিক্যালি ক্লিন্‌ড্ হল না, কিন্তু উপায় নেই। যা পাওয়া যায়।' সঞ্জু ঝুলঝাড়াটাকে মাটিতে শুইয়ে তার মাথায় কালির শিশিটাকে সুতো দিয়ে বেঁধে নিল। তারপর বারান্দায় এসে শিশিসুদ্ধ ঝুলঝাড়াটাকে বাড়িয়ে ধরল বাইরে। এখন বেশ ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

'এই যে স্যাম্পেল কালেক্ট করছি না, এরই মধ্যে সব রহস্য আছে। কাল সকালে বিজ্ঞানীদের টিম্ এলেই এটা তাদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। বৃষ্টির জল বিশ্লেষণ করলেই সব জানা যাবে।'

'তার জন্যে ঝুলঝাড়ার মুখে শিশি ঝোলাবার দরকারটা কি?' রজত আর না বলে পারে না।

'তুমি কি আমায় মারতে চাও? যদি কোন পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে থাকে বায়ুমণ্ডলে, তাহলে এই বৃষ্টির জল কি বিপজ্জনক হতে পারে জানো?'

প্রেসার কুকারটা আবার শিস্ মেরে উঠতেই তটস্থ হয়ে গেল রজত। প্রেসার কুকারদের এই দোষ। ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে কাজ সারতে পারে না।

'তবু তুমি রান্না করছো?' সঞ্জু বেশ কড়া গলায় ছোটকাকে ধমক দিল।

'রজা এই রজা! সঞ্জু যে তোকে বারণ করল। এত বয়স হল তবু নোলা গেল না! অ্যাঁ!'

মায়ের গলা কানে আসতেই রজত তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে হিটারটার সুইচ অন করে দিল।

'নকল সূর্য! নকল সূর্য!' হকাররা কাগজ বেচছে।

একটা কাগজ নিয়ে চল্লিশ পয়সা দিতে হকার বলল, 'আজ পঞ্চাশ পয়সা।' কাগজ কিনে বাড়ি এল রজত।

বিদ্যুত চুরি করে নকল সূর্য! বিরাট হেড লাইন।

রজত পড়তে শুরু করে, বোকারো তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের হাইটেন্‌সান্ লাইন থেকে বিদ্যুত চুরি করে কাল কোন এক অজ্ঞাত নামা বিজ্ঞানী কোন এক অজ্ঞাত গবেষণাগারে বসে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রাতের আকাশে এক নকল সূর্য জ্বেলেছিলেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই অজ্ঞাতনামা বিজ্ঞানী চুরি করা বিদ্যুতকে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটার ও বিকিরণকারী প্রতিফলকের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ঘনীভূত করেন।

এই তড়িত চৌম্বক রশ্মির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অণুগুলো তেতে উঠে ঝলমল করতে শুরু করে। নকল সূর্যের শিখায় বায়ুমণ্ডলে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তার ফলে নাইট্রিক অক্সাইড সৃষ্টি হয়। কাল রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বৃষ্টির জল পরীক্ষা করেই একথা জানা গেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের ভীত হবার কোন কারণ নেই। এর থেকে কোন ক্ষতি হবে না উপরন্তু নাইট্রিক অক্সাইড সার হিসেবে অতি মূল্যবান। ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে এই অজ্ঞাতনামা বিজ্ঞানী ও তাঁর গবেষণাগারের হদিশ বার করবার জন্য। হাই ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটার ও রেডিয়েটার নির্মাণ করে এই অজ্ঞাত বিজ্ঞানী যেমন তাঁর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি পরিচয় দিয়েছেন সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার। আমাদের দেশে যেখানে বিদ্যুত সংকটে কলকারখানার কাজ অবধি ব্যাহত হচ্ছে সেখানে নকল সূর্য তৈরি করার কি প্রয়োজন? অবশ্য এই হাইফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটারকে নাকি পরিবহণ ও শক্তি স্থানান্তরের কাজেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সে কাজ একটা জাতীয় গবেষণাগারের পক্ষেই শুধু গ্রহণ করা সম্ভব। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বিজ্ঞান মানুষের উপকারে লাগতে পারেনা।

রজত এক ধাক্কা দিয়ে সঞ্জুকে তুলল, 'পড়ে দ্যাখ্, কি লিখেছে। মহাপণ্ডিত হয়ে গেছিস তুই! রেডিও-অ্যাক্টিভিটি—রেডিওঅ্যাকটিভিটি করে কাল সারা রাত না খাইয়ে রেখেছিস!'

সঞ্জু মুহূর্তের মধ্যে রিপোর্টটা পড়ে ফেলে বলল, 'রেডিও অ্যাক্টিভিটি হোক্ বা না হোক ওই বৃষ্টির জল পরীক্ষা করেই কিন্তু রহস্য ভেদ হয়েছে। সেটা তোমার স্বীকার করতেই হবে। আমার পদ্ধতিতে কোন ভুল ছিল না।'

রজত হিটারের সুইচ্‌টা তুলে দিয়ে বলল, 'আমার পদ্ধতিতেও ভুল নেই। ব্যবস্থা যা করে রেখেছি তাতে মাংসটা এখন আরো জমবে।'

পশুপাখির পরিচয় ঃ করপক্ষবর্গ

বাদুড়

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

তোমরা সকলেই বাদুড় (Bat বা flying Fox) দেখেছ। চামচিকেও। বাদুড় বড়। চামচিকে ছোট। এরা একই জাতের। কয়েক রকম ছোট ছোট বাদুড়কেই চামচিকে (Cynopterus Marginatus) বলে।

এদের শরীরের ভেতর দিকটার সঙ্গে বানর বর্গের মিল খুব বেশি। এজন্যে বানরবর্গের পরেই করপক্ষ বর্গের জায়গা। প্রাণীজগতের এত উঁচুতে বাদুড়কে থাকতে দেখে অবাক হই। কি বিচিত্র এ জগৎ।

অনেকে বাদুড়কে পাখি মনে করেন। কিন্তু বাদুড় পাখি নয়। পাখির গায়ে পালক থাকে। বাদুড়ের গায়ে পালক নেই। পশুর মতো লোম আছে। বাদুড় ডানা মেলে পাখির মতো উড়তে পারে। সে ডানা পাখির মতো নয়। তাতে পালক নেই। বাদুড়ের ডানা পাতলা চামড়া দিয়ে তৈরী। ডানা দুটো বাদুড়ের হাত থেকে পা পর্যন্ত রয়েছে। তা হাত পা আর গায়ের সঙ্গে জোড়া। ডানার মাঝে মাঝে সরু সরু লম্বা হাড় আছে। এগুলো বাদুড়ের আঙুল। সব আঙুল বড়। বুড়ো আঙুলটি ছোট। বুড়ো আঙুলে বাঁকা নখ আছে। এরা লম্বায় বারো থেকে চোদ্দ ইঞ্চি। ডানা ছড়ালে ছেচল্লিশ থেকে বাহান্ন ইঞ্চি। চামচিকেরা লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি। ডানা ছড়ালে সতেরো থেকে কুড়ি ইঞ্চি অব্দি হয়। বাদুড়ের দাঁত আছে, কানও। পাখির কোনটাই নেই। পাখিদের শক্ত ঠোঁট আছে। বাদুড়ের মুখ ছুঁচলো। অনেকটা শেয়াল-কুকুরের মতো।

পাখিদের ডিম হয়। তা ফুটে ছানা। বাদুড়ের ডিম হয় না। বাচ্চা হয়। এরা মায়ের দুধ খায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাদুড় পাখি নয়। পশু।

পৃথিবীতে অনেকরকম বাদুড় আছে। ছোট ছোট বাদুড় বা চামচিকে মাত্র দেড় ইঞ্চি দু' ইঞ্চি লম্বা হয়। ছোট বড় সব জাতের বাদুড়েরই ডানা খুব বড় হয়। জাতি ভেদে সাদা, কালো, হলদে, কটা, ধূসর প্রভৃতি নানা রকমের বাদুড় দেখা যায়। এদের কোনটার কান ছোট। কোনটার কান বড়। কোন কোন বাদুড়ের কানের ভেতর পাতলা চামড়ায় তৈরী আর একটা কানের মতো জিনিস দেখা যায়। কোন কোন জাতের বাদুড়ের নাকের ওপর চামড়ার একটা পাতা উঁচু হয়ে থাকে। কারো কারো বা সেই পাতার নিচে আর একটা ছোট পাতা নাকের ফুটো ঘিরে থাকে।

ল্যাজও সকলের সমান নয়। কারোর ছোট, কারোর বড়। কোন কোন জাতের বাদুড়ের একেবারেই ল্যাজ থাকে না। বাদুড়ের স্পর্শশক্তি খুব জোরালো। ডানা, নাক ও কানের ওপরকার পাতলা চামড়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

বাদুড় নিশাচর প্রাণী। এরা অন্ধকারে থাকতে ভালোবাসে। হঠাৎ দিনের আলোয় বেরিয়ে পড়লে এদের চোখে ধাঁধা লাগে। বড় জাতের বাদুড় প্রায়ই দল বেঁধে থাকে। পাড়াগাঁয়ে এক একটা গাছে শ'য়ে শ'য়ে বাদুড় দেখা যায়। দু' পায়ে ডাল আঁকড়ে, মাথা নিচু কোরে ঝুলে থাকে, বিশ্রাম নেয় এভাবেই। এমনি কোরেই ঘুমোয়।

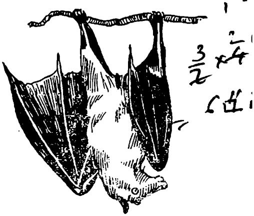

ফলাহারী বাদুড়

বড় ও মাঝারি বাদুড় প্রায়ই ফল খেয়ে থাকে। এরা গাছের আম, জাম, পেয়ারা, বাদাম, লিচু লুটপাট কোরে খায়।

ছোট বাদুড় পোকামাকড় খেতে ভালোবাসে। ভারতবর্ষের এক জাতের ছোট বাদুড় (Megadermalyra) রক্ত খেতে খুব পটু। এরা আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার (Vam-pire) জাতের মধ্যে পড়ে। তবে এরা চামচিকে

ভ্যাম্পায়ার

দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েক জাতের রক্ত-খাওয়া বাদুড় আছে। তাদের মধ্যে ভ্যাম্পায়ার প্রধান। 'ভ্যাম্পায়ার' গরু, ঘোড়া প্রভৃতির রক্ত খায়।

এরা অবশ্য বাঘের মতো কারও ঘাড় ভেঙে রক্ত খায় না।

শোনা যায়, এরা মানুষের রক্ত চুষে খায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। এরকমও শোনা যায়, কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলে এরা ধারালো দাঁত দিয়ে তার শরীরের কোন একটা জায়গা ফুটো করে। আর সেখান থেকে রক্ত টেনে খায়। ঘুমন্ত প্রাণী টেরও পায়না। রক্তপায়ী বাদুড় মাত্রই আকারে ছোট। ছোট-ছোট পাখি, ব্যাং প্রভৃতি অন্যান্য ছোটখাটো জীবের রক্ত ও মাংস খায়।

গ্রন্থকারের 'পশুপক্ষী' হইতে পুনর্মুদ্রিত

স্তন্যপায়ী ডিম পাড়ে

সুনীত রায়

স্তন্যপায়ী প্রাণী কি কখনো ডিম পাড়ে? মনে হয় অদ্ভুত, কিন্তু আসলে সত্যি কিছু প্রাণী আছে যারা স্তন্যপায়ী হয়েও ডিম পাড়ে। একিডনা এমনই এক অত্যাশ্চর্য প্রাণী। এদের দেহের কাঁটা আছে, চামড়া খসখসে ও অনমনীয়, নলের মতো নাক ও মুখ—সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা চেহারা। প্লেটিপাস, ডাক্‌হিল প্রভৃতি প্রাণীদের চরিত্রও অনেকটা একিডনার মতোই। যদিও এরা স্তন্যপায়ী, তবুও এদের দেহে একটা মাত্র অবসারণী ছিদ্র আছে, যার মাধ্যমে ডিমেরও প্রকাশ ঘটে।

একিডনা অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনিতে বাস করে, এরা বলিষ্ঠ বাঁকানো নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে পিঁপড়ে ও পোকামাকড় খায়। এদের ব্যাঙের মতো চট্‌চটে জিব্ খাদ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। যৌন সংযোগের সময়ে স্ত্রী একিডনার পেটে একটা থলির মতো অংশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, ডিমটা ঠিক কখন থলির মধ্যে এসে পড়ে তা আজও অজানা। ডিম পাড়ার সময়ে স্ত্রী একিডনা শরীরটা এমনভাবে বেঁকিয়ে ফেলে যাতে এক সঙ্গে দুটো তিনটে ডিম থলির মধ্যে এসে পড়তে পারে। যতদিন ডিম ফুটে বাচ্চা না বেরোয়, ততদিন তারা থলিতে ডিমগুলো বহন করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে এলে মাটি খুঁড়ে গর্তের মধ্যে রেখে দিয়ে খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে যায়। শত্রুর আঁচ পেলেই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে কিম্বা গায়ের বিষাক্ত কাঁটা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে। নিউগিনির একিডনা লম্বায় ত্রিশ ইঞ্চি আর অস্ট্রেলিয়ান একিডনার দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি থেকে তেইশ ইঞ্চি।

৭০১, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলিকাতা-৭০০০৩৪
৭৭-৩৫৬৭

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আজ ডিংকুদের বাড়ীতে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। বাড়ীর পাশ দিয়ে যে যাচ্ছে সেই বুঝতে পারছে একটা কিছু ঘটেছে ওদের বাড়ীতে। ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? এত হৈ হুল্লোড়ই বা কিসের জন্য?

—বাঃ রে, তোমরা কিছু জান না, আজ যে ওদের পাইলট ছোট মামা জুরিক থেকে ফিরছেন। পুরো সাত-সাতটা দিন উনি কোলকাতা থাকবেন। সেই সঙ্গে ভাগেদের সাথে চুক্তি হয়েছে ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাবের ছোট্ট একটা ফকার ফ্রেণ্ডশিপ উড়োজাহাজে করে ওদের ভুবনেশ্বর নিয়ে যেতে হবে। আর ছোটমামা ফিরে যাবার আগের দিন ডিংকুকে পাশে নিয়ে গ্লাইডারে উড়বেন। এর চেয়ে বড় খবর ওদের কাছে আর কি হতে পারে। পুরো দু'দুটো বছর ধরে ছোটর দল এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে। কাজেই আজ তারা একটু হল্লা-হাসি করবে বৈকি!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা ছোট মামাকে ঘিরে ধরল গল্প শোনার জন্য। মামা বললেন, কিসের গল্প বলব বল, স্বর্গের পরীদের?

বাবুন চিৎকার করে উঠল—না, মামা পরীর গল্প শুনতে চাইনে, আমরা আকাশে ওড়ার গল্প শুনব।

তিন বছরের টিংকু বলল—আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছি, পিঠে দুটো ডানা লাগিয়ে আকাশে উড়ছি, কি মজা!

মিঠুন বলল—আকাশে উড়ে থাকার আসল কৌশলটা কি, আমাদের সহজ কথায় বুঝিয়ে দাও না ছোট মামা!

মামা বললেন—'ঠিক আছে, আমি বুঝাতে চেষ্টা করছি—তবে তোমরা কতটা শিখলে পরে প্রশ্ন করে তা জেনে নেব।'

ছেলেরা গোল হয়ে মামাকে ঘিরে বসল। উনি আরম্ভ করলেন:

মাছেরা সাঁতার কাটে জলে। পাখী সাঁতার কাটে আকাশে। পাখীর দেহ এমন ভাবে তৈরী যাতে সে খুব সহজে আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু মানুষের মাছের মতো পাখনা নেই, পাখীর মতো ডানাও নেই। তবু মানুষ জলে সাঁতার কাটে। আকাশেও ওড়ে। মানুষ এটা করতে পারে তার বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের কৌশল কাজে লাগিয়ে।

পাখী যখন মাটি থেকে আকাশে উড়তে যায় তখন সে কি করে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ। বেশীর ভাগ পাখী উড়বার আগে ডানায় ভর দিয়ে লাফ দেয় আকাশে।

তুমি হাতলওয়ালা কোনও চেয়ার থেকে উঠবার সময় তার হাতলে ভর দিয়ে ওঠ। পাখীও ঠিক সেই রকম বাতাসে ভর দিয়ে উড়তে যায়। তোমাদের মনে হতে পারে বাতাস তো আর চেয়ারের হাতলের মতো শক্ত নয়, বাতাসে ভর দিয়ে ওঠার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে—তাই নয় কি?

আসলে বাতাসের চাপ বা ধাক্কা যে কী ভীষণ তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। একগ্লাস ভর্তি জল নিয়ে তার মুখে প্লাস্টিকের ঢাকনা লাগিয়ে গেলাসটা উল্টিয়ে ধর। এক ফোঁটা জলও ঐ গেলাস থেকে মাটিতে পড়বে না। গেলাসের নীচের দিকের বাতাস উপর দিকে চাপ দিচ্ছে আর সেইজন্যেই জল পড়তে পারে না।

ডানার ঝাপ্‌টা মেরে পাখী সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝি নৌকার দাঁড় দিয়ে পিছন দিকে জলে ধাক্কা দেয়। লক্ষ্য করবে দাঁড়টাকে জলের উপর তুলে নিয়ে সে আবার পিছন দিকে জলে ধাক্কা মারে। এই ভাবে দাঁড়ের সাহায্যে জলকে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে নৌকা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ওড়ার সময় পাখীর ডানা কি রকম করে ওঠানামা করে তা তোমরা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। সে তার ডানাকে উপর নীচ নাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় সহজে।

তোমরা হয়ত ভাবছ—পাখী নীচের দিকে ঝাপ্‌টা দিয়ে যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে উপরের দিকে ঝাপটা দেওয়ার সময়, তাকে নিশ্চয় পিছিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তা তো আর হয় না। আসলে পাখীর ডানার পালকগুলো এমন ভাবে সাজানো যে ডানা নীচের দিকে ঝাপটা দেবার সময় পালকগুলো একসাথে জুড়ে থাকে। কিন্তু যখন সে উপরের দিকে ঝাপটা মারে তখন ঐ সাজানো পালকগুলো সরে ফাঁক হয়ে যায় আর তার মধ্য দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়। প্রথম দিকে মানুষও পাখীর মতো ডানা দেহের দু'পাশে

লাগিয়ে আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছিল—একথা তোমাদের আগেই বলেছি। কিন্তু পাখীর ডানা সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি। ঐ রকম ডানা মানুষ তৈরী করতে পারল না। অবশ্য ১৭৪২ সালে ফরাসী ভদ্রলোক মাকু ইশ দ্য বাক্‌ভিল হাতে পায়ে ডানা লাগিয়ে প্যারিস শহরের সীন নদী উড়ে পার হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাঝ নদীতে আছড়ে পড়ে তিনি মারাত্মক জখম হন।

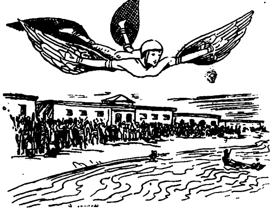

মাকু ইশ দ্য বাকভিল আকাশে উড়বার চেষ্টা করছেন

মানুষের দেহের ওজনও খুব বেশী। পাখীর দেহ বেশ হাল্কা। পাখীর দেহের ওজনও কম। আর তাই হাল্কা পাখীর ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে যত সুবিধা, মানুষের পক্ষে নকল ডানা লাগিয়ে উড়তে তত সুবিধা নেই।

বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়া অবশ্য পরে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বেলুনকে সহজে বাগে আনা যায় না। বেলুনের সাহায্যে খুশী মত আকাশে ওঠানামা করতেও ঢের অসুবিধা।

১৮৫২ খৃস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী জিফার্ড বিরাট এক বেলুনের সাথে স্টীম এঞ্জিন লাগিয়ে দিলেন। এঞ্জিনের সামনে একটা বড় পাখা ছিল। জিফার্ডের এঞ্জিনের পাখা সামনের দিক থেকে বাতাসকে টেনে এনে ঠেলে দিল পিছনে। আর এঞ্জিন সমেত বেলুনটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আমরা সাঁতার কাটি এই একই নিয়মে। হাত দিয়ে জল সামনে থেকে পিছনের দিকে ঠেলে ফেলি এবং তার ফলেই দেহটা এগিয়ে যায়।

জিফার্ডের এই আকাশযানের নাম হোল এয়ার-শিপ। তাঁর তৈরী প্রথম এয়ারশিপ ভালই চলেছিল। দ্বিতীয় এয়ার-শিপ দুর্ঘটনায় পড়ে। জিফার্ড কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

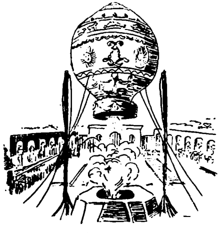

মংগলফিয়ার ভাইদের তৈরী বেলুন—১৭৮৩

এই পর্যন্ত বলে ছোট মামা একটু থামলেন। আর ঠিক সেই সময় ড্রাইভার রামসুক তেওয়ারী এসে জানাল—ছোটসাব, গাড়ী তৈয়ার। ছোট মামা বললেন—চল, এবার আমরা ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাব ঘুরে আসি। ছোটর দল সকলে পা বাড়িয়েই ছিল। অর্ডার পাবার সাথে সাথে দুম দাম শব্দে লাফাতে লাফাতে তারা গাড়ীতে গিয়ে হাজির হোল। সবারই একটা চাপা উত্তেজনা।

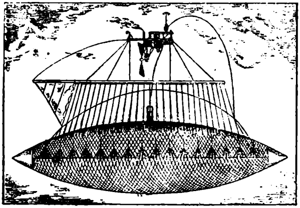

হেনরী জিফার্ডের বেলুন

গাড়ী নিউ আলিপুর দিয়ে জোরসে ছুটে চলেছে। ছোটমামার পাশেই বসেছিল ডিংকু। উনি ডিংকুর

হাতের তালুটা গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে বের করে সামনের দিকে ঢালুভাবে রাখতে বললেন। ডিংকু ঐ ভাবেই তার হাতটা রাখবার সাথে সাথেই চিৎকার করে বলে উঠল—"বুঝতে পেরেছি ছোটমামা এরোপ্লেনের ডানা বাতাসে কি ভাবে ঠেলা পায়।" ছোটমামা বললেন—কি করে বলত?

ডিংকু বলতে শুরু করল—হাতের তালুতে বাতাস জোরে ধাক্কা মারার ফলে তালুটা উপরের দিকে ঠেলা মারছে। যদি আমি তালুটাকে খাড়া ভাবে মেলে ধরি তাহলে বাতাসের ধাক্কায় তালুটা ঠেলা খাবে পিছন দিকে।'

ছোটমামা বললেন—এরোপ্লেনের ডানা দুটিকে যদিও আমরা বলি প্লেন বা সমতল তবু এরা সমতল নয়। ডানা দুটো বাঁকানো। এরোপ্লেনের ডানা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে বাতাস বইবার সময় তার ডানায় হাতের তালুর মতো কাজ হয়। ডানাগুলির সামনের অংশ কিছুটা ঢালু করে তৈরী করা হয়। এর ফলে দ্রুত প্রবাহিত বাতাস ডানার নীচের দিক থেকে ঠেলা মারে। ডানাগুলি এই রকম উপর দিকে যে ঠেলা পায় তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিকদের ভাষায়—'লিফ্‌ট'।

এরোপ্লেনের ডানার সামনের দিকের চাইতে যদি পিছনের অংশটা পাতলা হয় তাহলে লিফ্‌ট বেশী হবে। ওটা হবে কিন্তু এরোপ্লেনের ডানার ডিজাইনের জন্যেই। ডানার উপর অংশের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের অংশের বাতাসের চাইতে কম থাকে। এর ফলে তার ডানার নীচের বাতাস উপরের দিকে ঠেলা মারে বেশী জোরে। তার ফলে প্লেনটার বাতাসে ডানা মেলে ভেসে থাকতে সুবিধা হয়। এরোপ্লেনের ডানাকে ইংরেজীতে বলে—উইং।

মানুষের তৈরী যে জিনিস আকাশে উড়তে পারে তাদেরই আমরা বলি আকাশযান। এদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক—বাতাসের চাইতে যারা হাল্‌কা; দুই—বাতাসের চাইতে যারা ভারী। বেলুন, ঘুড়ি এরা বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা—কাজেই সহজেই ভেসে থাকতে পারে। কিন্তু এরোপ্লেন বাতাসের চাইতে বেশ ভারী। কোনও ভারী জিনিস টেনে তুলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। এরোপ্লেনে কি করে এই শক্তি আসে?

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম এক টুকরো লম্বা কার্ডবোর্ড নিয়ে বাতাসে একটু হেলিয়ে ছুঁড়ে দাও।

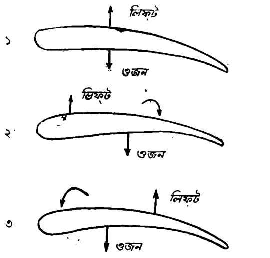

১। পিছুটানের জন্য এরোপ্লেনের ডানা স্থির হয়ে আছে।
২। সামনের দিকে লিফ্‌ট হওয়ায় ডানা পিছনে উল্টে যাচ্ছে।
৩। লিফ্‌ট পিছন দিকে হওয়ায় ডানা সামনে ঝুঁকে পড়েছে।

যখন ওটা বাতাসে ভেসে আছে অর্থাৎ ডানা স্থির তখন ঐ বোর্ডটার উপর দুটো চাপ পড়ছে। একটা উপরের দিকে—এটা হচ্ছে লিফ্‌ট। দ্বিতীয় চাপকে আমরা বলতে পারি পিছুটান বা ড্র্যাগ। কার্ডবোর্ডের ওজনের জন্যই এই পিছুটান পড়ছে তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ। উপর দিকের লিফ্‌টের শক্তি আর ওজনের জন্য পিছুটান যখন একই জায়গায় হবে তখন কার্ডবোর্ডটা বাতাসে ভেসে থাকবে। কিন্তু কার্ডবোর্ডের ডানা যদি একটুও বাঁকানো থাকে তবে লিফ্‌টের শক্তি এবং ওজনের জন্য পিছুটান শক্তির জায়গা সরে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে দেখ লিফ্‌টের শক্তি কার্ডবোর্ডের সামনের দিকে বা পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এটা যাতে না হয় তাই বিজ্ঞানীরা অনেক মাথা খাটিয়ে এরোপ্লেনের লেজের দিকে দুটি অনুভূমিক (Horizontal) ডানা লাগালেন। এদের আকার সামনের দুটো ডানার চাইতে ছোট। এরোপ্লেন যাতে চলবার সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে তাই এই ব্যবস্থা হোল। লেজের কাছের এই ছোট ডানা দুটির নাম এলিভেটর। আর ডাইনে বাঁয়ে প্লেনকে ঘুরানোর জন্য পিছন দিকে যে খাড়া হাল থাকে তাকে বলা হয় রাডার।

আর এইচ এস সাহাপুর, নিউ আলিপুর
ব্লক এন, ফ্লাট ৭, কলি ৩৮

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন ধুঁকছে

কিন্নর রায়

ভবানীপুরের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবনের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। মূল কারণ পয়সার অভাব। একথা জানালেন অজিত নারায়ণ রায়।

১৯৫৯ সালে যখন এই বিজ্ঞান ভবন চালু হয় তখন থেকেই অজিতবাবু আছেন। ডঃ ত্রিগুণা সেনের উৎসাহে এই বিজ্ঞান ভবন তৈরী হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ডঃ সেনও ছিলেন। আর ছিলেন ডঃ আশিস কুমার বসু ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জি এবং রামবিলাস শা।

ভবনের এখনকার সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ কুমার মজুমদার ডাক্তার। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। আগে থেকেই এই ভবনের সঙ্গে আছেন। এখানকার লাইব্রেরীর বই নিয়ে পড়েছেনও।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবনের টেক্সট বুক লাইবেরী আছে। এগারো/বারো ক্লাস থেকে শুরু করে বি. এ., বি. এস,-সি, বি. কম. কোর্সের বই আছে।

আশি জন সদস্য আছে এই বিজ্ঞান ভবনের। এরা অনেকে চাকরি-বাকরি করেন। বাকিরা ছাত্র। শখ করেই বিজ্ঞান ভবনে আসেন। এ তথ্য অজিতবাবুর। কি করব বলুন, ওদের মধ্যে হয়ত ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করত পারছে না এ বিজ্ঞান ভবন। অজিতবাবুই জানালেন।

ওঁর মুখ থেকেই শুনলুম, বিজ্ঞান ভবনের আরও দুটো ঘর ছিলো। টেলিফোন ছিলো। সব ছেড়ে দিতে হয়েছে। কারণ একটাই। টাকা যোগাড় করা যাচ্ছে না। এখন ওই সবেধন নীলমণি একটা ঘর। র‍্যাকে সাজানো বই। এপাশে ওপাশে ধুলো মাখা সায়ান্স এগজিবিট। দামী ব্যালেন্স বাক্সবন্দী, আছে ক্লোরিন গ্যাস তৈরীর জার। আরও কত কি। থাকলে কি হবে। কাজে লাগানোর ব্যবস্থা নেই। কতদিন এগজিবিশনই হয় না নিজেদের।

অজিতবাবু বললেন. বাড়িঅলা খুব ভালো মানুষ। পাঁচ বছরের ঘরভাড়া বাকি। সে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকার মতো। তবুও বাড়িঅলা কোনদিন কিছু বলেন না।

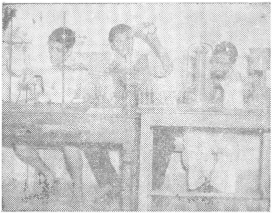

বিজ্ঞান ভবনের প্রদর্শনী (১৯৮০)

প্রতি মাসে একবার করে বৈঠক বসে ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে। আগে ডঃ সুশীল মুখার্জি, সংকর্ষণ রায়ের মতো মানুষেরা আলোচনা সভায় আসতেন। অনেক কিছু আলোচনা হোত। প্রস্তাব রাখা হোত। এখন এঁরা আসেন না। মানে আনার ব্যবস্থা করা হয় না।

এই ভবনের পক্ষ থেকে ১৯৬৭ সালে গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যকে তথ্যকেন্দ্রে প্রথম সম্বর্ধনা দেয়া হয়। তারপর সম্বর্ধনা দেয়া হয় শিবপ্রসাদ ব্যানার্জিকে। ১৯৭০ সালে কলকাতা মিউজিয়ামের উল্টোদিকে এক বিরাট বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এই সংস্থা। খুব ধুমধাম করে।

প্রত্যেক সদস্যকে এক টাকা করে চাঁদা দিতে হয় লাইব্রেরীর জন্যে। সায়ান্স ক্লাবের জন্যে আলাদা কোন চাঁদার ব্যবস্থা নেই। এঁরা মাঝে মাঝেই নিজেদের সায়ান্স এগজিবিট প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে বিনা পয়সাতেই বাইরে পাঠান। ১৯৮০ সালে ৭টা সায়ান্স ক্লাব ও স্কুলে এঁরা সায়ান্স এগজিবিট পাঠিয়েছেন। যাঁরা এগজিবিট নিয়ে যায় তারা গাড়িভাড়া দেন। এর মধ্যে আছে মেদিনীপুরের দুটি, হাওড়ার দুটি, হুগলীর দুটি এবং কলকাতায় একটি। কখনও কখনও বাইরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে এঁরা নিজেদের ছেলেদেরও পাঠান।

প্রতি বছর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ২রা আগস্টকে এঁরা বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালন করেন।

১৯৭৯ সালে এরা ২রা আগস্ট বিজ্ঞান দিবসের যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিলো আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও অন্যান্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, বিশ্ব-বিজ্ঞানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা, সমাজজীবনে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তহবিল সংগ্রহ। ফি-বছর প্রায় একই অনুষ্ঠান হয়। নেমন্তন্ন হয় স্কুল ও বিজ্ঞান ক্লাবেদের।

১৯৮০-৮১ সালে এই সংস্থা বিড়লা মিউজিয়ামের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয়া পাঁচশো টাকা পেয়েছেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় সে টাকা একেবারেই নস্যি। বহুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বছরে একশো টাকা পাওয়া যেত তা বন্ধ হয়ে গেছে।

অজিতবাবু জানালেন, বিজ্ঞান নিয়ে ইদানীং একটু হৈ-চৈ হচ্ছে বটে। তবে ঠিক মতো টাকা-পয়সা আর অন্যান্য সাহায্য নিয়মিত না পাওয়া গেলে এ ধরনের বিজ্ঞান ক্লাবকে জিইয়ে রাখা মুস্কিল। আর এইসব ক্লাব না থাকলে বিজ্ঞান ভাবনা গড়ে তুলতে গেলে বহু বাধা আসবে।

ও'র মতে এই সমস্ত বিজ্ঞান চর্চাগুলো বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কিন্তু ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যেমন সরকার যদি কোন ছোট বা বড় শিল্প তৈরি করার আগে, যে এলাকায় শিল্পটি তৈরী হতে যাচ্ছে, তার একটা সার্ভের দায়িত্ব বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে দেন, তাহলে ছেলেরা উৎসাহ পায়। কিছু পয়সা রোজগারের পথও তৈরী হয়।

উনি আরও বললেন, ধরুন যদি কোন জেলায় সরকার মিনি কাগজকল বসান, তাহলে কাঁচা মাল, শিল্পের জায়গা এবং পুঁজির ব্যাপারে এই সব বিজ্ঞান সংস্থা বিস্তারিত সার্ভে করতে পারে। শুধু তাই নয়, কাগজের মণ্ড তৈরী হতে পারে গ্রামের ঘরে ঘরে। যেমন কাগজের ঠোঙা হয়। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা-করা-সংস্থারা সহজেই এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এর দ্বারা বেকারির দাপট কমবে। মানুষের হাতে কিছু পয়সা আসবে।

এ বছরের ২রা আগস্টও এই সংস্থার পক্ষ থেকে আচার্য প্রফুল্ল রায়ের জন্মদিনকে বিজ্ঞান দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে।

ও'রা চাইছেন একটি নিয়মিত বিজ্ঞানের কাগজ বের করতে। পরিকল্পনা আছে আরও অনেক কিছুর।

২রা আগস্ট বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে এই সংস্থা সায়ান্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সংগে বিজ্ঞান মিছিলে যোগদান করেছিলেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিহার্য বই

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড : একাদশ শ্রেণী

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস ৮/১এ,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

বিজ্ঞান পদযাত্রা

সুনীত রায়

মিছিল, শোভাযাত্রার শহর এই কলকাতা। বিভিন্ন দাবী আর সমস্যার সমাধানে হয়ে ওঠে সরগরম মিছিল নগরী কলকাতা। কিন্তু জনজীবনের মধ্যে নির্মল পরিবেশ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রকল্পনা নিয়ে কোন মিছিল বা পদযাত্রা আগে কলকাতার বুকে কখনো দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। গত ২রা আগস্ট ১৯৮১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১২০তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন্ অব্ বেঙ্গল—পরিবেশের মধ্যেই আপনি, পরিবেশকে নির্মল করুন, নির্মল জল, নির্মল হাওয়া, নির্মল পরিবেশ, প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পোস্টারের মাধ্যমে পরিবেশ বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার প্রয়াসে এই অভিনব পদযাত্রার আয়োজন করেন। এই পদযাত্রার শুভ সূচনা ঘটান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক দিলীপ কুমার সিংহ ও সংস্থা সম্পাদক শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। এই বিজ্ঞান পদযাত্রার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এর প্রয়োজনীয়তা কি?—এই প্রসঙ্গে শ্রী রায়চৌধুরী মনে করেন, এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য হল কল্যাণমুখী, সমাজমুখী, ও বিজ্ঞানমুখী সমাজ গঠন করার। সকাল ৯-১৫ মিনিটে বিজ্ঞান পদযাত্রা কালীঘাট ফায়ার স্টেশন থেকে শুরু হয় ও শেষ হয় কলেজ স্কোয়ার-এর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মর্মর স্মৃতির পাদদেশে। এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, বেলতলা গার্লস হাই স্কুল, নব নালন্দা স্কুল, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড্ লাইফ ফাণ্ড-ইণ্ডিয়া, সাউথ সুবার্বন স্কুল (মেন), সরশুনা হাই স্কুল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সংসদ, যাদবপুর বিজ্ঞান ক্লাব, গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, তাহেরপুর বিজ্ঞান পরিষদ, বিপন্ন বান্ধব ও ব্রতচারী সমিতি প্রভৃতি স্কুল, বিজ্ঞান ক্লাব ও সমাজসেবামূলক সংস্থা।

সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের উদ্যোগে বিজ্ঞান পদযাত্রা

একসঙ্গে এত বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও অধ্যাপকদের—এরকম করে একই বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে চলা এক অভাবনীয় ব্যাপার। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ আনন্দদেব মুখার্জী, ডঃ জগবন্ধু হালদার, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, অমিত চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী, ইন্দ্রজিত রায়, দেবাশীষ গুহমজুমদার, ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। এই পদযাত্রার আর একটি আকর্ষণ ছিল ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান মডেল ও চার্ট প্রদর্শনী। এটির আয়োজন করেছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন এবং পাইওনীয়ার সায়েন্স ক্লাব।

দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সেখানে একটি ছোট স্মরণ-সভার আয়োজন করেছিলেন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা। এই স্মরণ-সভায় জল দূষণ, বায়ু দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ কিভাবে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে, সাধারণ মানুষ, শিল্প সংস্থা ও সরকারকে কোন দৃষ্টি ভঙ্গীতে পরিবেশ নির্মল রাখতে চিন্তা করতে হবে, সে বিষয়ে শ্রী রবীন বল বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীমণি দাশগুপ্ত, দীপক দাঁ, সুবীর সেন, কবীর সুরচৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ডঃ ক্ষেত্র প্রসাদ সেনশর্মা বলেন, দু একটি রি-এ্যাক্টর তৈরী করে বা আকাশে অ্যাপল

উড়িয়েই ক্ষান্ত হলে হবে না—সাধারণ স্তরে সকলের মধ্যেই বিজ্ঞান চেতনা সম্প্রসারিত করতে হবে।

বিক্ষোভহীন এই অভিনব পদযাত্রায় মহানগরীর নিদ্রিত বিবেকের কাছে এক সকরুণ আবেদন—নির্মল করুন পরিবেশ, নির্মল করুন সমাজ। এই পদযাত্রাই আমাদের আগামী দিনের এক সুস্থ সমাজের অধিকার এনে দেবে বলে, দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ বেঙ্গলের সহকারী সম্পাদক মনে করেন।

আলোকচিত্র ঃ—রবি দে

অর্থাভাবে বৃত্তি দেওয়া সম্ভব হল না

জগদীশচন্দ্র বসু জাতীয় মেধা অনুসন্ধান বৃত্তির বাৎসরিক উৎসব গত ২১শে আগস্ট '৮১, আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে, বৃত্তি প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হল ও বিভিন্ন তরুন বিজ্ঞানীদের তৈরী মডেল প্রদর্শনীরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। নিষ্ঠা ও সততা থাকলে যেকোনো সামান্য কাজই যে অসামান্য পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, সে বিষয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ অরুনকুমার শর্মা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

প্রত্যেক বছরই প্রথম দশজন স্থানাধিকারীকে মাসিক ২৫০ টাকা করে পাঁচ বছরের জন্যে বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু, এই বছরে অর্থাভাবে দশম স্থানাধিকারী বৃত্তি পেলেন না। বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমরা টাকা খরচ করি, কিন্তু কোনো তরুন বিজ্ঞানীকে উৎসাহ দিতে আমরা এগিয়ে আসতে পারি না, সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল টি, এন, সিং এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে, তিনি তরুন বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে অহ্বান জানান। এই বছরে যারা বৃত্তি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের সুশান্ত বসু, মেডিকেল কলেজের সৌগত সান্যাল, খড়্গপুর আই. আই. টির সুরজিৎ সেনগুপ্ত, প্রেসিডেন্সী কলেজের সোমক রায়চৌধুরী, খড়্গপুর আই. আই. টির সঞ্জয় বাজাজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তপন মিশ্র, খড়্গপুর আই. আই. টির সুব্রত গাঙ্গুলী, শিবপুর বি. ই. কলেজের স্বপনকুমার চ্যাটার্জী, লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজের রিঙ্কু দত্ত। এছাড়া আরো কিছু তরুণ বিজ্ঞানীকে উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া হয়।

লণ্ডন ইণ্টারন্যাশানাল ইউথ সায়েণ্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়শনের আমন্ত্রণে সৌগত সান্যাল ও সুশান্ত বসু, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ পুরস্কার পেয়ে লণ্ডন ঘুরে আসেন। এই বছরে শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, নরেন্দ্রপুর। সাংবাদিক

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
ওঠ, বাড়ী আর বেশী দূরে নয়।
শক্তি নিঃশেষ, খুব হেঁটেছি।
বুঝেছি, তোর স্টীম চাই।
স্টীম? সে আবার কী?
সেই যে, জেমস ওয়াট আবিষ্কার করেছিল?
গল্পটা জানি,— কেট্‌লীতে জল ফুটতে দেখে...
স্টিফেনসন আবার সেই স্টীমেই রেলগাড়ী চালিয়েছিল।
রেলগাড়ী? এখানে কোথায়?
রেলগাড়ী নয়, কেট্‌লী!
আহ্ এখানে যদি রেলগাড়ী পেতাম
এক কাপ গরম চায় সেই স্টীম পাবি!
হিহি—হিহি! রেলগাড়ী!

বাস্তবের মুখোমুখি

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

এই শহরের সমস্যা চিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলোবাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, খোলা নর্দমা, খাটা পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা দিনে মাছি, পথ কুকুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, মস্তানি, গুণ্ডামি, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরাকারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে থেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন:

(১) জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবেন।

(২) নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না।

(৩) রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

(৪) দেওয়ালে কুৎসিৎ কিছু লিখবেন না।

(৫) ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না।

(৬) রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি: কর বাকী ফেলবেন না।

(৭) ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মবালী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHOR JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

KISHOR JNAN-BIJNAN • Srabon - 1388, Sept.'81, D. No. 25/81

শারদসঙ্কলন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
পুরস্কৃত

পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১

পরিচালনায় : দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল

SAB

• প্রশংসা পত্র •

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় দি সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আয়োজিত ও কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির - ৮১ অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষায় অতি সুন্দর ও সুপরিকল্পিত সহকারে বিজ্ঞান পত্রিকা "কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান" প্রকাশে সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও বিজ্ঞান প্রসারে মানসিকতার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মাননীয় শ্রী রবীন বল মহাশয়কে এই সম্মানমূলক প্রশংসাপত্র অর্পিত হইল ॥

চিত্তব্রত মজুমদার
চেয়ারম্যান
পঞ্চম নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবির-৮১
ও
মন্ত্রী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা।